সন্দীপন

সন্দীপন

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

সাহিত্য-বার্ষিকী

১৯৮৬-৮৭

প্রকাশক : অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
ঢাকা ১২০৭

প্রচ্ছদ : সাঈদউদ্দীন হেলাল, সপ্তম শ্রেণী
তত্ত্বাবধানে, চারু ও কারুকলা বিভাগ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ
ঢাকা ১২০৭

মুদ্রণে : ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
ঢাকা ১০০০

কলেজের বোর্ড অব গভর্নরস-এর বর্তমান সদস্যমণ্ডলী

সচিব — চেয়ারম্যান
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা
(জনাব এম, এ, সাঈদ)

উপাচার্য — সদস্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
(ডঃ আব্দুল মান্নান)

মহা-পরিচালক — সদস্য
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা
(ডঃ এম, এ, করিম)

চেয়ারম্যান — সদস্য
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
(জনাব এ, আর, চৌধুরী)

যুগ্ম সচিব — সদস্য
অর্থ বিভাগ
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা
(জনাব এ, বি, চৌধুরী)

জনাব শামসুল হক চিশ্‌তি — সদস্য
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা
(শিক্ষানুরাগী প্রতিনিধি)

জনাব ইয়াকুব খান — সদস্য
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
সড়ক ও জলপথ পরিদপ্তর
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা
(অভিভাবক প্রতিনিধি)

ডাঃ জি, এম, শহিদ উদ্দিন আহমেদ — সদস্য
সহযোগী অধ্যাপক
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা
(অভিভাবক প্রতিনিধি)

জনাব শেখ মোঃ ওমর আলী — সদস্য
সহযোগী অধ্যাপক
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা
(শিক্ষক প্রতিনিধি)

অধ্যক্ষ — সদস্য-সচিব
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা
(জনাব গিয়াসউদ্দিন হায়দার চৌধুরী)

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ

অধ্যক্ষ গিয়াসউদ্দিন হায়দার চৌধুরী

সম্পাদনায় ঃ

বাংলা বিভাগ

জনাব আব্দুর রাজ্জাক
মিসেস দিল রওশন বানু
মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম
জনাব শরীফ হারুন

সহযোগিতায়

মাস্টার মাসুদ হাসান,	দ্বাদশ	শ্রেণী (বিজ্ঞান)	'৮৬-৮৭
মাস্টার আবু হোসেন চৌধুরী	দ্বাদশ	,, (মানবিক)	,,
মাস্টার আবু জায়েদ মোহাম্মদ	দ্বাদশ	,, (,,)	,,
মাস্টার এইচ, এম, সরোয়ার আলম	দ্বাদশ	,, (,,)	,,
মাস্টার তারেক ওসমান	দশম	,, (,,)	,,
মাস্টার সাঈদ উদ্দীন হেলাল	সপ্তম	,, (,,)	১৯৮৭
মাস্টার তানভীর দৌলা	সপ্তম	,,	,,

ইংরেজী বিভাগ

জনাব এ, বি, এম, শহীদুল ইসলাম
জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ্

সহযোগিতায়

মাস্টার নাভিদ আহমেদ	দ্বাদশ	শ্রেণী (বিজ্ঞান)	'৮৬-৮৭
মাস্টার সাইদুল করিম	দশম	,, (,,)	,,
মাস্টার কাজী হাসীম মুস্তাহিদ	দশম	,, (,,)	,,

ব্যবস্থাপনায় ঃ

জনাব মোঃ শামসুল হক	উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত জুনিয়র শাখা)
জনাব মোঃ আহসানুল্লাহ	সহযোগী অধ্যাপক
জনাব আব্দুর রাজ্জাক	সহকারী অধ্যাপক
মিসেস দিল রওশন বানু	সহকারী অধ্যাপিকা
জনাব শরীফ হারুন	প্রভাষক
শ্রী খগেন্দ্র কুমার সরকার	প্রভাষক
মিসেস মাহ্‌বুবা হাবীব	প্রভাষিকা
শ্রী শীলব্রত চৌধুরী	গ্রন্থাগারিক
জনাব এম, এম, ফজলুর রহমান	প্রদর্শক

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী

১।	জনাব গিয়াসউদ্দিন হায়দার চৌধুরী	অধ্যক্ষ
২।	জনাব মোঃ শামসুল হক	উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
৩।	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত, জুনিয়র শাখা)

বাংলা বিভাগ

১।	জনাব এ, কে, এম, আব্দুল মান্নান	সহকারী অধ্যাপক
২।	মিসেস আর, এন, হক	সহকারী অধ্যাপিকা
৩।	জনাব আব্দুর রাজ্জাক	সহকারী অধ্যাপক
৪।	মিসেস দিল রওশন বানু	সহকারী অধ্যাপিকা
৫।	মিসেস রওশন আরা বেগম	,, ,,
৬।	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম	প্রভাষিকা

ইংরেজী বিভাগ

১।	জনাব এ, বি, এম, শহীদুল ইসলাম	প্রভাষক
২।	জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ্	,,
৩।	জনাব ইরশাদ আহমেদ শাহীন	,,
৪।	জনাব মোঃ মোস্তফা	,,
৫।	মিসেস ফরিদা রুবী	,,
৬।	মিসেস নিশাত হাসান	,,

গণিত বিভাগ

১।	জনাব ফয়জুর রহমান	প্রভাষক
২।	মিসেস দিল আরা বেগম	প্রভাষিকা
৩।	জনাব নজরুল হক জায়গীরদার	প্রভাষক
৪।	জনাব আবদুল লতিফ	,,

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

১।	জনাব এ, টি, এম, জালালউদ্দীন	প্রভাষক
২।	জনাব আব্দুল জাব্বার	,,
৩।	জনাব এম, এম, ফজলুর রহমান	প্রদর্শক

রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ

১।	জনাব মোঃ আতাউল হক	সহকারী অধ্যাপক
২।	জনাব গোলাম মুর্তজা	,, ,,
৩।	মিসেস মাহফুজা ওয়ালী	প্রভাষিকা
৪।	জনাব সুলতানউদ্দীন আহমেদ	প্রভাষক
৫।	শ্রী মানিক চন্দ্র ঘোষ	প্রদর্শক

জীববিজ্ঞান বিভাগ

১।	জনাব নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া	প্রভাষক
২।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	,,
৩।	জনাব মোঃ সানাউল হক	প্রদর্শক

ভূগোল বিভাগ

১।	জনাব কাজী রেজাউল ইসলাম	সহকারী অধ্যাপক
২।	জনাব সুজা-উদ-দৌলা	প্রভাষক
৩।	জনাব আব্দুল মোমেন খান	প্রদর্শক

অর্থনীতি বিভাগ

১।	জনাব মোঃ আহ্সানুল্লাহ	সহযোগী অধ্যাপক
২।	শ্রী প্রলয় কুমার গুহ নিয়োগী	প্রভাষক

ইতিহাস বিভাগ

১।	জনাব শেখ মোঃ ওমর আলী	সহযোগী অধ্যাপক
২।	জনাব এ, এস, এ, আই, কে, ইউসুফজাই	সিনিয়র লেকচারার (আণ্ডার সাসপেনসান)
৩।	মিসেস হাসনা আজিজ	সহকারী অধ্যাপিকা
৪।	মিসেস উম্মে সালমা চিশ্তী	,, ,,
৫।	মিসেস শামীম রহমান	প্রভাষিকা
৬।	জনাব নজরুল ইসলাম	প্রভাষক

পৌরনীতি বিভাগ

১।	মিসেস রহমান শাহীন	প্রভাষিকা

যুক্তিবিদ্যা বিভাগ

১।	জনাব শরীফ হারুনুর রশীদ	প্রভাষক

বুক-কীপিং বিভাগ

১।	জনাব খালেদুর রহমান	প্রভাষক

ইসলামী শিক্ষা বিভাগ

১।	জনাব এ, বি, এম, আব্দুল মান্নান মিয়া	সহকারী অধ্যাপক
২।	জনাব হেমায়েতউদ্দীন আহমেদ	প্রভাষক
৩।	জনাব লোকমান আহমেদ আমীমী	মৌলভী
৪।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	”

চারু ও কারুকলা বিভাগ

১।	শ্রী খগেন্দ্র কুমার সরকার	প্রভাষক
২।	মিসেস মাহবুবা হাবীব	প্রভাষিকা

ক্রীড়া বিভাগ

১।	জনাব হেলালউদ্দীন আহমেদ	প্রভাষক
২।	জনাব জেড. এইচ, মাহবুব আমজাদ	সহকারী পি, টি, আই,
৩।	জনাব আবু তাহের	” ”
৪।	জনাব খলিলুর রহমান	” ”

গ্রন্থাগার

১।	শ্রী শীলব্রত চৌধুরী	গ্রন্থাগারিক

চিকিৎসাকেন্দ্র

১।	ডাঃ আব্দুল লতিফ	মেডিকাল অফিসার

অধ্যক্ষ গিয়াসউদ্দিন হায়দার চৌধুরী

অধ্যক্ষের বাণী

সভ্যতার সূচনা থেকে মানুষ মননশীলতার চর্চা করে আসছে। এই মহৎপ্রয়াসের নান্দনিক অভিব্যক্তি ঘটে সাহিত্য ও শিল্প কর্মে। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের সৃষ্টি ও অবস্থান। জন্মলগ্ন থেকে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠতে গিয়ে সে অবলোকন করছে উদার, উন্মুক্ত আকাশ, অবারিত প্রান্তর, সুউচচ পাহাড়, পর্বতমালা, গভীর বনানী, স্রোতস্বিনী নদী আর দিক চিহ্নহীন সাগর, মহাসাগর। এই নিসর্গ তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে মানুষকে আবেগতাড়িত করে, কল্পনাশ্রয়ী করে। করে তোলে দার্শনিক। আবার, প্রকৃতি একাধারে মমতাময়ী, অপরূপা, উদাসীন, নির্মম ও ভয়াল।

আবার, প্রকৃতি আর মানুষকে ধারণ করে আছে সুবিশাল পৃথিবী। এই পৃথিবীর বিস্তৃত অঙ্গনে মানব-মানবী প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, লোভ-লালসা ঈর্ষা-দ্বেষ, স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা, ত্যাগ, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী আবেগের সম্পর্কে প্রতিনিয়ত আলোড়িত হচ্ছে। এই বিভিন্নমুখী আবেগের অভিব্যক্তি ঘটে কখনও সংলাপে, কখনও বর্ণমালায় বা কখনও তুলির আঁচড়ে। আবেগ প্রকাশের ব্যাকুলতা কোন নির্দিষ্ট বয়স সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জন্মলগ্ন থেকে বার্দ্ধক্যের অন্তিমকাল পর্যন্ত মানুষের মনের আকুতি নানাভাবে বাঙময় হতে চায়। এই জন্যেই মানুষ সৃজনশীল। এবং এ সৃজনশীল প্রক্রিয়ারই মহৎ প্রচেষ্টা এ মহাবিদ্যালয়ের বালক-কিশোর-তরুণদের সাহিত্যকর্ম : সন্দীপণ।

কলেজ বার্ষিকীর ক্ষুদ্র পরিসরে নানা বয়সের তরুণ-কিশোর সৃষ্টিশীল হবার প্রয়াসী হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টা সৎ এবং আন্তরিক। কিছু সুন্দর, সুস্থ, পবিত্র মনের উৎসরণ ঘটেছে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে। তারুণ্যের দীপ্তিই লেখাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। চিন্তা বা অনুভূতির গভীরতা এবং অভিজ্ঞতার চমক এদের রচনায় খুঁজতে গেলে বয়সের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে তাদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। তবে, যদি কোন কোন রচনায় আগামী দিনের কবি, সাহিত্যিকের সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটে থাকে, তা হবে আমাদের জন্যে আকস্মিক আনন্দময় আবিষ্কার।

আমার তরুণ-কিশোর সাহিত্যকর্মীদের এবং বার্ষিকী প্রকাশনায় যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের আন্তরিক শত শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি কলেজ বার্ষিকীর ক্রমাগত সাফল্য কামনা করছি।

২৬শে আষাঢ়
১ ৩ ৯ ৪

গিয়াসউদ্দিন হায়দার চৌধুরী
অধ্যক্ষ

সম্পাদকীয়

মানুষ স্বভাবতঃই আত্মসম্প্রসারণবাদী। আর তার এই সম্প্রসারণ ঘটে প্রধানত তার সুকুমার চিত্তবৃত্তির বিকশন তথা সৃষ্টিক্ষম-প্রজ্ঞার পথ ধরে আত্মবিকশনের মধ্য দিয়ে। সৃষ্টিই মানব জীবনের অন্যতম প্রধান ধর্ম; আর সাহিত্য সৃষ্টি তার মনন-প্রকর্ষ ও সৌন্দর্যবোধের নিদর্শন। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে অজ্ঞতার তিমির ভেদ করে চলেছে মানুষের জয়যাত্রা অনন্তকালে অসীমের উদ্দেশ্যে। নিজেকে সে শতদলের মত বিকশিত করে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, চায় পরিপূর্ণ আত্ম-তৃপ্তি। এটাই মানব মনের শাশ্বত বাসনা।

সৃষ্টির সেই উন্মাদনা ও অত্যুগ্র বাসনা জন্ম দিয়েছে এ মহতী প্রচেষ্টার—যার নাম 'সন্দীপন'। তবে আমাদের এ বার্ষিকী উপস্থাপনার সুমহান আদর্শ আরও ভিন্নমুখী সুদূর প্রসারী ও নিঃসন্দেহে আশা-ব্যঞ্জক। এতদিন ধরে সম্ভাবনাময় অংকুরেরা শতদল হয়ে পরিস্ফুটনের বেদনায় হৃদয়ের গহীনে কেবল গুমরে মরছিল। সেই শৃঙ্খলিত লেখনীর মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মত বাধাহীনভাবে ডানামেলার সুযোগ এনে দিল এ 'সন্দীপন'।

কলেজ বার্ষিকীর মুখ্য স্থপতি এর ছাত্রবৃন্দ। তাদেরই অফুরন্ত প্রাণ-চাঞ্চল্য ও আন্তরিক সদিচ্ছার দ্বারা এ বার্ষিকীর ভাবগত চেতনা ও রূপগত অবয়ব গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। সাহিত্য যদি জীবনের দর্পন হয়, তবে এদের কাঁচা হাতের অপরিপক্ক সৃষ্টির দর্পনে সে জীবন কতটুকু বিশ্বস্তভাবে বিম্বিত হয়েছে জানি না। তাই এদের আন্তরিক প্রয়াসের সার্থকতার বিচারের ভার বিবেকবান ও বিদগ্ধ পাঠকের উপর রইল। এদের লেখনীর অপরিপক্কতা যদি বিদগ্ধ পাঠকের মনকে সামান্যতম আলোড়নেও ব্যর্থ হয়, তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী। তবে সাথে সাথে এ কথাও স্মর্তব্য, যে ফুল প্রস্ফুটিত হয়নি, শুধুমাত্র বিকাশ-উন্মুখ, তার কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ বিকশিত ফুলের সৌরভ আশা করাটা দুরাশা মাত্র। এ সাহিত্য বার্ষিকীর 'সন্দীপন' নামকরণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এর নামায়ণ তখনি সার্থক হবে যখন মৃনাল-নিন্দিত ঘুমন্ত ছাত্রমনের অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান পিপাসা, সর্বোপরি তাদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে 'সন্দীপন' সন্দীপিত ও উদ্দীপিত করতে সক্ষম হবে। এ বার্ষিকী প্রকাশনা সফল হবে তখন, যখন এ সব ঘুমন্ত মঞ্জরী পূর্ণাঙ্গ পুষ্পে পরিণত হয়ে তাদের সৌরভে সকলকে মোহিত করতে পারবে, তাদের লেখনী হতে যখন জীবনধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে দেশ ও দশকে অনুপ্রাণিত করবে।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষাতেই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্বাধিক প্রতিফলিত হয়। তবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য অনস্বীকার্য। তাই, আমাদের প্রয়োজন বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষার উপযুক্ত পরিচর্যা। আর এ উদ্দেশ্যেই এ বার্ষিকীতে একটি ইংরেজী বিভাগ সংযোজিত হয়েছে।

সাধ থাকলেও সাধ্য আমাদের সীমিত। তাই, সীমিত কলেবরেই আমাদের এ সৌন্দর্যের ফসলকে ঘরে তুলতে হয়েছে। এ কারণে অনেক সম্ভাবনাময় লেখনী এ কাজে অংশ নিতে পারেনি। বার্ষিকীর সীমিত পরিসরের জন্য তারা তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়নি। আশা করি, বারান্তরে তাদের লেখা দ্বিগুণ প্রত্যাশার সমৃদ্ধি আনবে, আনবে আনন্দ।

এ বার্ষিকী কোন একক প্রচেষ্টার ফসল নয়—অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ। এ কলেজের ছাত্রবৃন্দ ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর অকৃপণ সহযোগিতায় এবং সর্বোপরি মাননীয় অধ্যক্ষের সচেতন ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় সবার হাতে এসেছে 'সন্দীপন'। পরিশেষে, এ বার্ষিকীর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

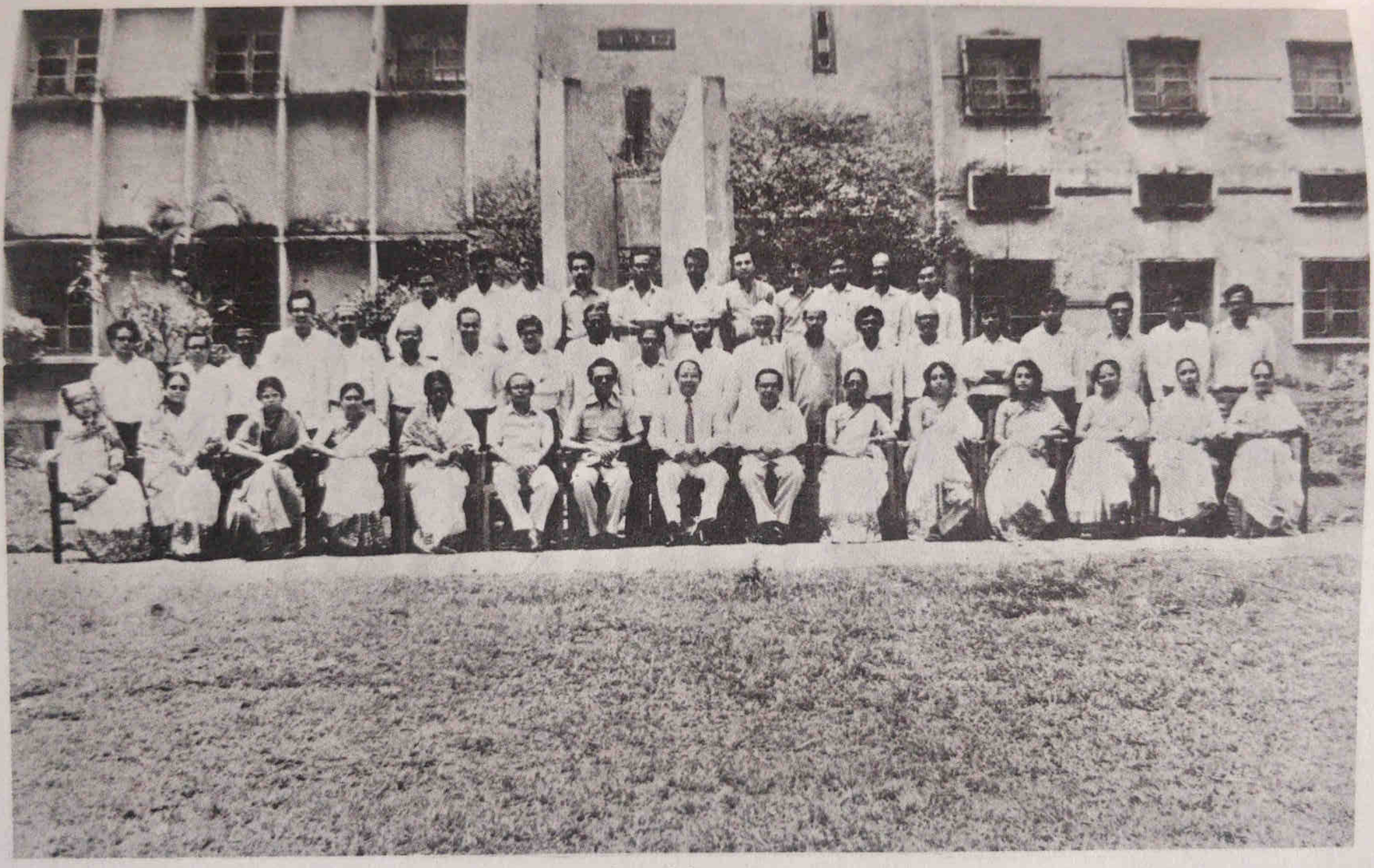

শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

সূচীপত্র

কবিতা

বক মামা	১	গোলাম রহমান
আমার ইচ্ছা	১	রাশেদ লতিফ
আশিক	১	মোঃ পারভেজ
দুটি ছড়া	৩	শেখ শফিউল আলম
মশার গান	৫	সালেহউদ্দীন আহমেদ
আমার কবিতা লেখা	৬	মোঃ মাহফুজ কামাল
মানুষ চেনা	৬	রিয়াজ আহমেদ
ছড়া	৬	আশফাক নবী
বর্তমান বিশ্ব	৭	মেহেদী মাহবুব হাসান
লাভ	১৪	এ. কে. এম. বাশার
দরিদ্র	১৪	মোঃ দেলোয়ার হোসেন
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী হল	১৯	রায়হান লতিফ
গোলাপ ও মাটি	১৯	মোঃ মহীবুর রহমান
এসো রক্ত-সত্তা গড়ি	২২	শিহাব আহমেদ
ছয় ঋতু	২২	চৌধুরী ফয়জুর রব
বহুরূপী জীবনকে দেখেছি	২৪	আবু হোসেন চৌধুরী
সময়	২৭	চৌধুরী ফয়জুর রব
মাতৃভূমি	৩৪	মোঃ মাইনুল কবির

গল্প

স্বপ্নে মঙ্গল গ্রহ	২	সাঈদউদ্দিন হেলাল
তৃতীয় নয়ন	৮	ফায়সাল শাহরিয়ার আহমেদ
ডুয়েল	১০	শিহাব আহমেদ
একটি ঝরা ফুল	২৫	চৌধুরী ফয়জুর রব

প্রবন্ধ

শান্তির অন্বেষণে	১৫	এইচ. এম. সরোয়ার আলম
প্রকৃত শিক্ষিত কে	২০	এ. কে. এম. সিরাজউদ্দীন আহমেদ
বিশ্বের আশ্চর্যতম রহস্য	২৩	মনিরুজ্জামান
মিলাদ শরীফ: প্রাসঙ্গিক আলোচনা	২৮	লোকমান আহমদ আমীমী
আর রক্ত নয়	৩০	সুলতান উদ্দিন আহ্‌মেদ
মানব জীবন ও যুক্তিবিদ্যা	৩৩	মো: খোরশেদ আলম
সুর সপ্তক	৩৫	মো: দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী

বিবিধ

এখানে সেখানে	৪	মীর মো: ইউসুফ কামাল
জানা-অজানা	৭	মুহম্মদ মহীউদ্দীন মজুমদার
হাউস প্রতিবেদন	৩৮	কুদরত-ই-খুদা হাউস
হাউস প্রতিবেদন	৪০	জয়নুল আবেদীন হাউস
হাউস প্রতিবেদন	৪১	ফজলুল হক ছাত্রাবাস
হাউস প্রতিবেদন	৪৩	নজরুল ইসলাম হাউস
হাউস প্রতিবেদন	৪৪	লালন শাহ হাউস
শোক সংবাদ	৪৬	
কলেজ সংবাদ	৪৮	
অধ্যক্ষের ভাষণ	৫৩	চতুর্বিংশতিতম অভিভাবক দিবস ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পঠিত

ENGLISH SECTION

Contents

Burma : A Land of Pagodas	1	Navod Ahmed
Islam and Modern man— An Anatomy	3	Abu Zayed Mohammad
As You Like It	5	A. B. M. Shahidul Islam
The Quarter century of Dhaka Residential Model College	7	Sk. Md. Omar Ali

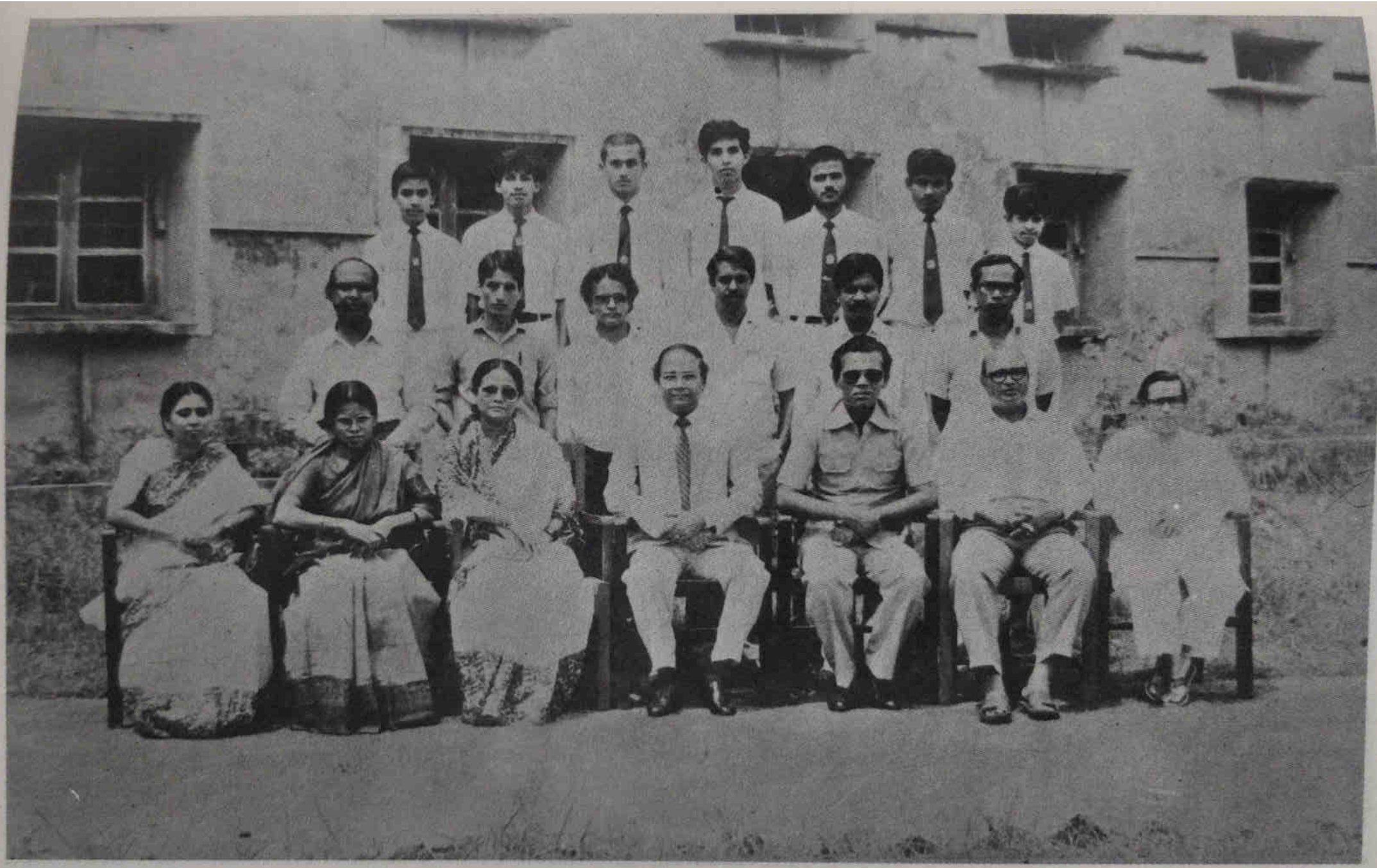

কলেজ সাহিত্য বার্ষিকী কমিটি

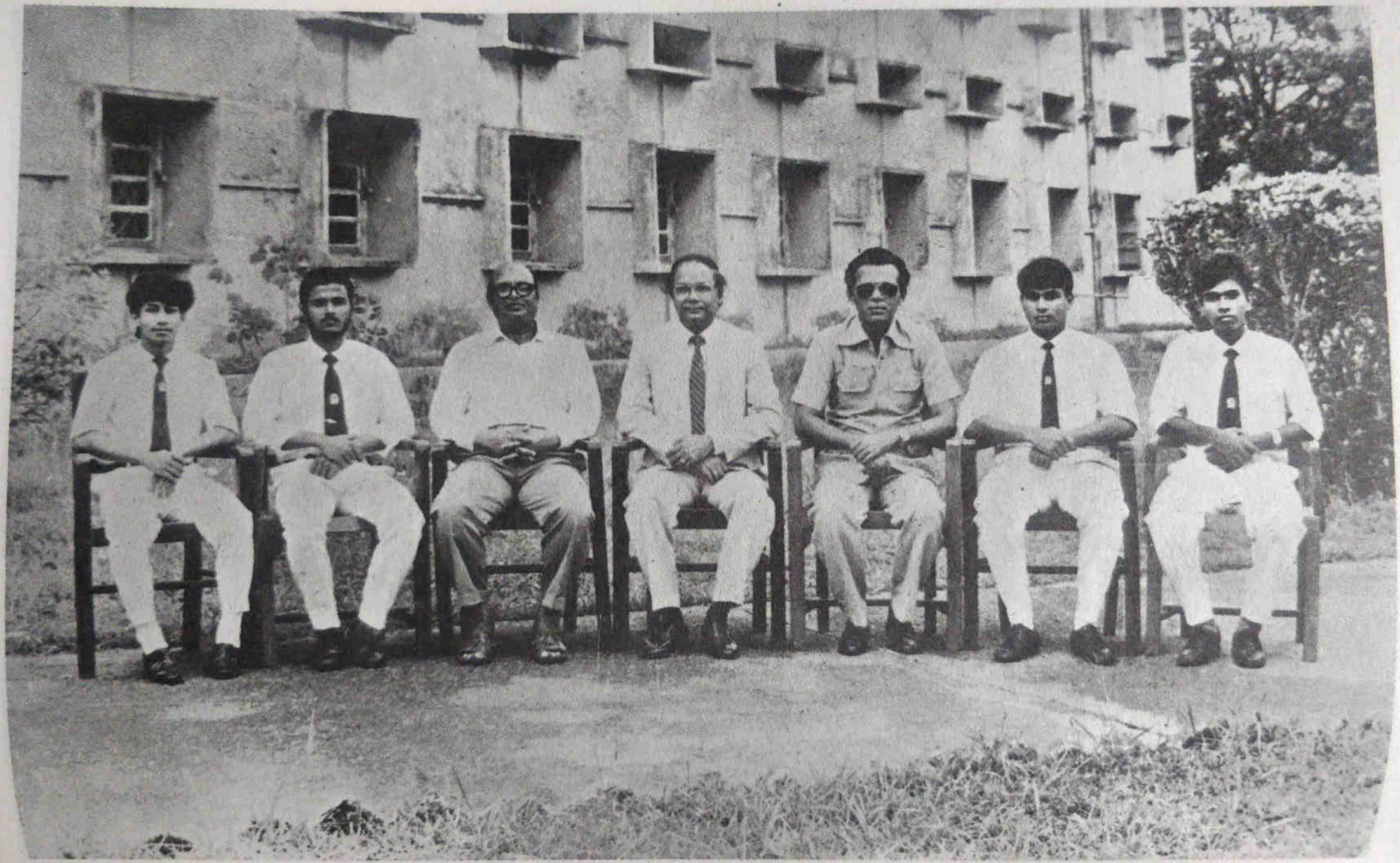

কেন্দ্রীয় প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড

বকমামা

গোলাম রহমান
কলেজ নং ৪১৪৩
দ্বিতীয় শ্রেণী

বক মামা, বক মামা
গায়ে দিয়ে লাল জামা
কোথা তুমি যাও ?
চুনো পুটি খাও ?
চুনোপুটি খেতে খেতে
শ্বশুর বাড়ী যাও ?
শ্বশুর বাড়ী মধুর হাড়ি
কোনখানে সেই গাঁও ?
সঙ্গে যাবে ময়না টিয়া
তৈরী আছে নাও।

আমার ইচ্ছা

রাশেদ লতিফ
কলেজ নং ৪১৫৩
দ্বিতীয় শ্রেণী

আমার ইচ্ছে আমি হবো
মস্ত বড় ডাকতার,
মাগুম বলেন কেমন করে।
পড়া লেখায় শুধু ফাঁকি যার।
আমি বললাম মাগো---
এখন তো আমি ছোট্ট অতি,
বড় হলে পড়া লেখায়
হবেই ঠিক সুমতি।
ডাকতার আমি হবই হবো।
তার পরে তে বিদেশ যাবো।
বিদেশ থেকে ফিরে এসে
করবো লোককে বশ,
তোমার ছেলের মাগো তখন
বাড়বে অনেক যশ।

আশিক

মোঃ পারভেজ
কলেজ নং ৩৭৩০
ষষ্ঠ শ্রেণী, ক শাখা

নাম তার আশিক
হাসে ওই ফিকফিক।
গোলগাল চেহারা
যেন পালকির বেহারা।
লেখাপড়ায় নেই মন
ঘোরে শুধু বন বন।

স্বপ্নে মঙ্গল গ্রহ

সাঈদউদ্দিন হেলাল
কলেজ নং ২৯৬৬
সপ্তম শ্রেণী, 'খ' শাখা

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া ছোট্ট অন্তু সন্ধ্যায় জানালার পাশে বসে ভাবছিল মঙ্গল গ্রহের কথা। আজ তাদের বাংলা ক্লাশে "মঙ্গল গ্রহে" গল্পটি তারা পড়েছে। এমন সময় বড় বোন অন্তরা এসে বলল, "অন্তু সোনা এখনও পড়তে বসনি?" অন্তু আপার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "আপা পড়তে ভাল লাগছে না, তুমি আমাকে মঙ্গল গ্রহের গল্প শোনাবে?" আপা হেসে অন্তুকে পাশে বসিয়ে দূর আকাশে আঙুল তুলে বলল, "ঐ যে, একটা তারা স্থির হয়ে আছে ঐটাই মঙ্গল গ্রহ।" অন্তু বলল, "যাহ ওটাতো সন্ধ্যাতারা।" "হ্যাঁ, অন্তু আসলে মঙ্গল গ্রহকেই সন্ধ্যার সময় 'সন্ধ্যা-তারা' আর প্রভাতে 'শুকতারা' বলে।" এই বলে অন্তরা আপা শুরু করল মঙ্গল গ্রহের গল্প। অন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনল আর তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মঙ্গল গ্রহের এক বাস্তব ছবি। আপার কথা শুনতে শুনতে এক সময় সে দেখতে পেল দূর থেকে পিরিচের মত উজ্জ্বল কি যেন ভেসে আসছে—হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানিতে অন্তুর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। যখন সে চোখ খুলল দেখল অবিকল অন্তরা আপার মত এক মেয়ে তার শিয়রে বসে আছে। "আপা" বলে কাছে গিয়ে বুঝল, না ও তার অন্তরা আপা নয়, কারণ ওর চোখের মনি সম্পূর্ণ সবুজ আর চুলগুলিও অদ্ভুত সবুজ লালে মেশানো রঙের। মেয়েটি অন্তুকে আদর করে বলল, "কি অন্তু ভয় পেয়েছ? ভয় পাবার কিছু নেই, আমি ক্লারাপোট্রেন, মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা। মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে তোমার অসীম আগ্রহ দেখে আমাদের গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেনা-পোটেন তোমাকে সসারে তুলে এনেছেন।" অন্তু কেঁদে বলল, "না, আমি আমার আপার কাছে যাব।"—"অবশ্যই যাবে, তার আগে আমাদের গ্রহে ঘুরে আসবে।"—কথাটি ক্লারা বলতে না বলতেই অন্তুর মনে হল ওরা কোথাও নামছে; এমন সময় হঠাৎ সসারটির চলা থেমে গেল। অন্তুর সামনে এসে দাঁড়ালো লম্বা কতকগুলি আজব ধরনের লোক। সেই সময় ক্লারাকেই অন্তুর সবচে' আপন মনে হল। ক্লারার হাত ধরে অন্তু নেমে গেল এক নতুন জগতে—মঙ্গলের মাটিতে। অন্তু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল আকাশের রং গোলাপী, সামনে নদী বয়ে গেছে, তার জলও গোলাপী। ক্লারা অন্তুকে দূরে হাত তুলে বলল, "অন্তু ঐ যে উঁচু পাহাড় দেখছ, ঐটিই "অলিম্পাস মন্স।" তোমাদের হিমালয়ের চেয়ে তিনগুণ উঁচু"। ছোট অন্তুর বিস্মিত চোখ আরো বিস্মিত হয়ে গেল। ক্লারার হাত ধরে অন্তু অনেক ঘুরল, অনেক দেখল কিন্তু অন্তু অবাক হয়ে দেখল কোন লোক এই খানে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। এর কারণ ক্লারাকে যে মাত্র জিজ্ঞাসা করতে যাবে অমনি ক্লারা নিজে থেকেই বলল, "ওদের উধাও হয়ে যাওয়া দেখে অবাক হচ্ছ, তাই না অন্তু।" আসলে আমাদের অনেক কাজ করতে হয়, অনেক জায়গায় যেতে হয়। কখনো কয়েক শত মাইল যেতে হয় সেকেণ্ডের মধ্যে। তাই আমরা উচচ শক্তিধর এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করি। যা আমাদের মুহূর্তের মধ্যে উধাও করে সে স্থানে পৌঁছে দেয়।" অন্তু আরেক প্রশ্ন করতে যাবে তক্ষুণি ক্লারা বলল, "তুমি জানতে চাচ্ছ কি করে তোমার মনের প্রশ্নের জবাব দিলাম, তাই না?" অন্তু অবাক হয়ে মাথা নাড়ল। ক্লারা বলল, "আমরা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত। পৃথিবীর মানুষ যাকে আজ সর্বোচ্চ বিজ্ঞান বলে জানে, তা আমাদের কাছে নিছক ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে মনে মনে সমস্ত প্রশ্ন, উত্তর আদান-প্রদান করে থাকি।" এই বলে ক্লারা একটা ট্যাবলেট বের করে অন্তুকে দিয়ে বলল,

"অন্তু তোমার তো খিদে পেয়েছে ট্যাবলেটটা খেয়ে নাও।" অন্তু অবাক হয়ে যেতেই ক্লারা বলল, "খাওয়া-দাওয়ার পেছনে আমরা সময় নষ্ট করি না। তাই ট্যাবলেট খাই। তোমাদের চেয়ে এতে food value আছে প্রচুর।" ট্যাবলেটটা মুখে দিতেই অন্তু এক ঝাকুনি খেল। ভাল করে চোখ মেলে দেখে অন্তরা আপা মাথা, ধরে ডাকছে। "অন্তু সোনা ভাত খাবে না।" অন্তু বলল, "খিদে নেই আপা। আমি ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেছি।" আপা বলল "কি যাতা বকছ। তুমি কি স্বপ্ন দেখছিলে?"—"না আপা", বলতে যেয়েও অন্তু থেমে গেল। এত বাস্তব ঘটনাকে সে কি করে স্বপ্ন বলবে। ক্লারা আপার ট্যাবলেট খেয়ে এখনও তো তার পেট ভরা। তারপর ধীরে ধীরে তার সব মনে পড়ল। তখন অন্তু বুঝল সে অন্তরা আপার "মঙ্গল গ্রহ" সম্বন্ধে গল্প শুনতে শুনতে নিদ্রা দেবীর কোলে ঢলে পড়েছিল।

দুটি ছড়া

শেখ শফিউল আলম
কলেজ নং ৩৬৬৩
চতুর্থ শ্রেণী

।। ১ ।।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
ময়ূর নাচে পেখম খুলে
বৃষ্টি পড়ে হাওয়ার তালে
নাচে ময়ূর দুলে দুলে।

।। ২ ।।

এক যে ছিল পিটার
বাজাতো বসে গিটার
ছেলে সে খুব ভাল
মন করে না কালো।

এখানে-সেখানে

মীর মোঃ ইউসুফ কামাল
কলেজ নং ২৩৯৫
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

জুতো প্রীতি

ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পত্নী ইমেলদা মার্কোসের আরও ১৬শ জোড়া জুতার সন্ধান মিলেছে। এর আগে ৩ হাজার জোড়া জুতোর সন্ধান পাওয়া যায় এবং এনিয়ে বেশ সমালোচনাও হয়। প্রেসিডেন্ট কোরাজনের গঠিত একটি তদন্ত কমিশন মার্কোসের গুপ্ত সম্পদের সন্ধান পায়। মিসেস কোরাজন একুইনো জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য মালাকান প্রাসাদে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই জুতোগুলো প্রদর্শনী সামগ্রী হিসেবে রেখে দিয়েছেন।

সাড়ে ২২ কোটি বছর আগের জীবাশ্ম

মার্কিন বিজ্ঞানীরা কুমেরুতে গড়ে ২২কোটি বছর আগের সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীর জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান ফাউণ্ডেশন একথা জানায়। বিজ্ঞানীরা প্রায় সাড়ে ৩শর বেশী মেরুদণ্ডী জীবাশ্ম পেয়েছেন। ট্রান্স-এণ্টারটিকা পর্বত এলাকায় কাজ করার সময় তারা এগুলো পান। এসবের মধ্যে চারটি নতুন প্রজাতির উভচর ও সরীসৃপ প্রাণীর হাড় রয়েছে।

এরফলে বিজ্ঞানীরা কুমেরুর এসব প্রাণীর বসবাসের যথার্থ সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন সূত্র পাবেন। এসব প্রাণীর বিবর্তনের ধারাও জানা যাবে।

৩ হাজার বছর আগের কফিন

মিসরে তিন হাজার বছর আগের কফিন পাওয়া গেছে। কফিনটি বিখ্যাত ফারাও দ্বিতীয় রামসেস-এর আমলের একজন প্রভাবশালী প্রধান মন্ত্রীর বলে ধারণা করা হচ্ছে। কায়রো থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিম সাকারা গোরস্থানে কফিনটি পাওয়া গেছে। ৪ হাজার ৭শ বছর আগের সিঁড়ি পিড়ামিড এই গোরস্থানেই অবস্থিত। এই পাথরের কফিনের গায়ে প্রধান মন্ত্রী নাফর রেইণ্ট-এর নাম লেখা রয়েছে।

প্রাচীন গ্রাম

চীনের প্রত্নতাত্বিকেরা উত্তর পূর্ব চীনের হিলজিং প্রদেশের ল্যাঙ্কি কাউন্টিতে এমন একটি স্থান খুঁজে বের করেছেন যেখানে ২৭শ বছর আগে একটি গ্রাম। ১ লাখ ২০ হাজার বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে এ গ্রামটি ছিল। এ প্রাচীন গ্রামের পূর্ব অংশে চারটি ভবনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এর মাঝে হাই মাছের হাড় ও কাঠ কয়লাসহ রান্না ঘরের অংশও রয়েছে প্রত্নতাত্বিকরা মাটির পাত্র, পাথরের হাতিয়ারসহ অন্যান্য বহু প্রাচীন উপকরণ উদ্ধার করেছেন।

বার্মার জিরাফ মহিলা

বার্মার কায়া এলাকায় মহিলারা লম্বা আর সরু গলার জন্য বিখ্যাত ছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষও তাদের দেখার জন্য সেখানে আসত। এ মহিলাদের গলা অস্বাভাবিক রকমের লম্বা। এমনিতে অবশ্য এরকম হতোনা। তারা এক ধরনের রিং ব্যবহার করে গলাকে শক্ত আর লম্বা করতো। জন্ম নেবার পরেই শিশুদের মা-বাপ তাদের বাচচার গলায় রিং পরাতো তা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পরে থাকতে হতো। এরা বার্মার জিরাফ মহিলা নামে বিখ্যাত। অবশ্য এ রিং ব্যবহার বার্মায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রহস্যময় চুনি পাথর

থাইল্যাণ্ডে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকার মূল্যের একটি চুনি পাথর পাওয়া গেছে। ধারণা

করা হচ্ছে বিশ্বে এটি সবচেয়ে বড় চুনিপাথর। এ চুনি দেখতে হাজার হাজার দর্শনার্থীর প্রচণ্ড ভিড় জমে, এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রেম তিনসুলানন্দও দর্শকদের একজন হয়ে আসেন। প্রায় ১০০ পুলিশ প্রদর্শনী পাহারা দিচ্ছে। প্রদর্শনী শেষে ঐ স্থানেই চুনি সংরক্ষিত করা হয়েছে।

হস্তিনীর ঈর্ষা

লস এঞ্জেলেসে চিড়িয়াখানার বদমেজাজী হস্তিনী তারা তার চাইতে অপর একটি কম বয়েসী একটি হস্তিনীকে মেরে ফেলেছে। কারণ সে এখানকার একমাত্র পুরুষ হাতি হানিবলের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল। চিড়িয়াখানার একজন মুখপাত্র একথা জানান।

ছোট হস্তিনীটির নাম ম্যাকক্লেইন। সে যখন চিড়িয়াখানার চার পাশ ঘেরা তিন মিটার গভীর খাদের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তখন তারা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঐ খাদে ফেলে দেয়। পড়ে গিয়ে ম্যাকক্লেইনের ঘাড় ভেঙ্গে যায়। চিড়িয়াখানার মুখপাত্রের মতে আবেগই ছিল এ হত্যার কারণ।

বৃহত্তম জাহাজ

ফ্রান্সে নির্মিত হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় যাত্রীবাহী জাহাজ। এই জাহাজে দু'হাজার দু'শ ছিয়াত্তর জন যাত্রী চড়তে পারবে। এটা দৈর্ঘে হবে দু'শ আশি মিটার। ১৯৮৮ সাল নাগাদ এটি ভাসবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাহাজটি নির্মাণে ব্যয় হবে আনুমানিক ৪০ কোটি মার্ক (একমার্ক = ১৫ টাকার কিছু বেশী)।

মশার গান

সালেহউদ্দীন আহমেদ
কলেজ নং ৩১৭০
ষষ্ঠ শ্রেণী

মাথার উপর ভো ভো
ঘোরে শুধু মশা
মারতে গিয়ে পাই না নাগাল
বাড়ে করুণ দশা।

মশার গানে ঝালাপালা
হলো দুটি কান
হুল ফুটিয়ে মনের সুখে
করেন রক্তপান।

আমার কবিতা লেখা

মোঃ মাহফুজ কামাল
কলেজ নং ৪০১১
ষষ্ঠ শ্রেণী

নাইট ক্লাশে আপন মনে
কবিতা লিখছি বসে
হঠাৎ টিচার এসে গালে আমার
চড় লাগালেন কষে।
চড় খেয়ে সাথে সাথেই
ঘুরে গেল মাথা,
ভাবতে বসে কাঁপতে থাকি
গায়ে জড়াই কাঁথা।
মগজে তো আসে না কিছু
যতই করি চেষ্টা,
শব্দের মিল খুঁজতে গিয়ে
বেরে যায় মোর তেষ্টা।
চুপি চুপি কিচেন গেলাম
খেতে ঠাণ্ডা পানি
কলার খোসায় আছার খেয়ে
ভাঙ্গলো গেলাসখানি।
বাবুচি ভায়ার ভাঙ্গলো ঘুম
লাগলো হুটোপুটি
বিপদ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে
কবিতা নিল ছুটি।

মানুষ চেনা

রিয়াজ আহমেদ
কলেজ নং ৩৪৪৯
সপ্তম শ্রেণী

দুঃসময়ে আসবে না কেও
সবাই হবে পর,
এই কথাটি মনে রেখো
সারা জীবন ভর।

সুসময়ে আসবে সবাই
হয়ে আপন জন,
সবাই হবে বন্ধু তোমার
ভরবে তোমার মন।

যুগে যুগে জগৎ মাঝে
চলছে এই রীতি,
সময় ও সুযোগ বুঝে
পাল্টে যায় নীতি।

মানুষের এই স্বভাবটা
চেনো যদি ঠিক
মনে দাগা পাবে নাকো
হারাবে না দিক।

ছড়া

আশফাক নবী
কলেজ নং-২৬৮১
নবম শ্রেণী (বিজ্ঞান)

মাহবুবুর রহমান
করে শুধু দুধ পান।
চুপ চাপ ছেলে সে
লেখা পড়া করে যে।
ক্লাশের ফার্স্ট বয়
সবাই তাকে ভালো কয়।

জানা-অজানা

মুহম্মদ মহীউদ্দীন মজুমদার
কলেজ নং ৪১০৪
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

বই পড়ুয়া : বই এমন একটা জিনিস যা পড়লে কারো কোন ক্ষতির আশংকা নেই। বরঞ্চ জ্ঞান অর্জন হয়। তো সেই বই আমরা কতই বা পড়ি ? টি,ই, লরেন্স অক্সফোর্ডে থাকা কালীন ছয় বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বই পড়ে ছিলেন—অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ২৩টি করে বই তিনি পড়েছেন। সারা জীবনে আমরা কি এত বই পড়তে পারি ?

আজব ঘড়ি : নতুন এক ধরনের ঘড়ি আবিষ্কার করেছেন সুইজারল্যাণ্ডের এক বিজ্ঞানী নতুন ধরনের এই ঘড়িটি রেডিওর সময় সংকেত শুনতে পায়, এবং সে অনুসারে নিজেই প্রয়োজন বোধে সময় ঠিক করে নিতে পারে।

বেল বার্ড : এ পৃথিবীতে এক ধরনের পাখী রয়েছে যারা কিচির-মিচির করে ডাকে না, কিংবা মিষ্টি সুরে শিস দেয় না। যখন এরা ডাকে তখন মনে হয় যেন ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে তাই এই ধরনের পাখীকে বেলবার্ড বলা হয়। এই পাখী আফ্রিকায় পাওয়া যায়।

ফুটবলের যাদুকর : ১৯৮৬ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক দিয়াগো ম্যারাডোনা অপূর্ব ক্রীড়া নৈপুণ্য এবং ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে ফুটবলের নতুন যাদুকর রূপে অভিহিত হয়েছেন। তিনিই এবারের বিশ্বকাপে ফুটবলে একমাত্র শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার।

বর্তমান বিশ্ব

মেহেদী মাহবুব হাসান
কলেজ নং ২৮২৩
অষ্টম শ্রেণী

অন্যায় সর্বত্র—
সর্বত্রই অন্যায়,
লিবিয়া প্যালেস্টাইন, ভিয়েতনাম,
আর মরু ইথিওপিয়ায়।
পরাশক্তির হিংস্র আক্রমণ,
নিরীহ দুর্বলের অভ্যন্তরে,
বিষাদের কালো ছায়া
শান্তিকামীর অন্তরে।
শোষিত বিশ্বের ক্ষুধার্ত শিশুর
সকরুণ চোখের দৃষ্টি।
ভবঘুরে জীবন আর বস্ত্রহীন শীতার্ত অঙ্গ—
এক মহা অনাসৃষ্টি।
আর শোষক বিশ্বে প্রাণবন্ত শিশুর সব
চোখে খুশীর খেলা।
বিলিওনিয়ারের লাখমূল্য শখ
বসেছে আজব মেলা।
এক মুঠো ভাত জোটে না যে দেশে
বেকার তরুণ সমাজ,
আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তারা
প্রতিরক্ষা সাজায় আজ !
দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে
যুদ্ধ ছেলেখেলা ;
অত্যাধুনিক অস্ত্রের জোয়ারে
মরণ ভাসায় ভেলা।
সভ্যতারই অহংকার
মানুষ দেখায় বেশ
সভ্যতারই অঙ্কুর তারা
করতে পারে শেষ।

তৃতীয় নয়ন

ফায়সাল শাহরিয়ার আহমেদ

কলেজ নং ৩০৮৩

নবম শ্রেণী

জিউলীর সরু ডাল দিয়ে তিতাসদের বাড়ীর সামনের দিকটা ঘেরা। সে বাড়ীতে লাল টালির ছাদ। বাগানে অনেকগুলি কলা বতির গাছ। আরও আছে জামরুল গাছ। খুব টুসটুসে ফল হয়।

আমাদের এই ছোট্ট শহরে তিতাসের খুব নাম। স্কুলে পড়তেই ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় বিদেশ থেকে অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছে। খবরের কাগজেও হাসি মুখের ছবি তোলা হয়ে ছিল। ওর স্কুলের ড্রইং টিচার বলতেন, "তিতাস খুব নামকরা শিল্পী হবে। ওর তুলির জোর সাংঘাতিক।"

একবার পুরস্কার আনতে কোলকাতা গিয়েছিল তিতাস। তখন কি সাড়া পড়ে গিয়েছিল আমাদের মফস্বল শহরে। স্কুলে ওর সম্মানে এক অনুষ্ঠান হল। এস, ডি, ও, সাহেব সভাপতি ছিলেন। আমরা দেখছিলাম ফুলের মালার নীচে ডুবে যাচ্ছে লাজুক ছেলে তিতাস। খুব ইচ্ছে করে ওর পাশাপাশি হাঁটি, ওর সাথে গল্প করি।

ভোরের নরম আলোতে কখনো কখনো কুরুলিয়া খালের পাশে ওকে হাঁটতে দেখেছি। খালে কচুরিপানা টোপাপানা। পায়ের নীচে ভেজা মাটি। শালুক ঝিনুক। ঝিনুকে খোল পড়ে থাকে। দূরের চরগুলো থেকে আলু বোঝাই নৌকা আসত। তিতাস শিরিষ গাছের নীচে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি ভাবতাম ও মনে হয় চারপাশে রঙের পরিবর্তন দেখছে।

কমনওয়েলথ-এর একটি প্রতিযোগিতায় সোনার পদক পেয়ে আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরে তিতাস আরো বিখ্যাত হয়ে উঠল। এক বিকালে ঝাউগাছের ছায়াতে আমি আর তিতাস হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ ও চোখে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

: কি হলো, কি হলো তিতাস?

: কি যেন একটা পড়েছে চোখটা খুব জ্বলছে।

হাত সরাতেই দেখলাম ওর বাম চোখটা টকটকে লাল হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি রুমালে ভাপ দিয়ে ওর চোখটা চেপে ধরলাম। তিতাস খুব ছটফট করছিল ঘটনার আকস্মিকতায় আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সে রাতে ওকে মিশন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার বললেন চোখের ব্যাপার, খুব খারাপ দিকে টার্ণ নিতে পারে। ওকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিৎ।

তিতাসদের বাড়ীর সবার মুখ থমথমে। তিতাস শুধু যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। মাঝ রাতের ট্রেনে করে ওকে শহরে নিয়ে যাওয়া হল। দু'দিন পর খবর পেলাম তিতাসের চোখে অপারেশন করা হবে। আই ব্যাংকে অন্য লোকের একটি চোখ পাওয়া গেল, লোকটি তার চোখ দান করে গিয়েছিল। সেটা দেওয়া হল তিতাসকে। এক মাস পরে সুস্থ হয়ে ও ফিরে এল, আমি অবাক হয়ে তিতাসকে দেখছিলাম ওর বাঁ চোখটা অন্য লোকের। একটু শুকিয়ে গেছে। কেমন গম্ভীর থাকে।

: তিতাস ছবি আঁকবে না?

: ভাল্লাগে না।

ওর নির্লিপ্ত উত্তর শুনে খুব খারাপ লাগে তিতাস ছবি আঁকার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। বাইরে কাঠবাদামের গাছ থেকে কয়েকটা পাখি ঝটপট উড়ে যায়। কিছু শুকনো পাতা খসে পড়ে।

সামনে পরীক্ষা। দিনরাত বাসায় থাকি কোথাও যাওয়া যায় না। একদিন তিতাসদের বাড়ি গেলাম দেখি ওর ছোট বোনটা বারান্দায় বসে ফুপিয়ে কাঁদছে।

: কি হয়েছে টুরি কাঁদছে যে ?

: আমার পোষা পায়রাটাকে কে যেন মেরে ফেলেছে।

: কোথায় ?

টুরি আমাকে ওদের বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে যায়। একটা কলা-বতি গাছের নীচে পাখিটা মরে পড়ে আছে। পায়রার গলাটাকে যেন মুচড়িয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। কোন পশু এরকম করে না। লাল পিঁপড়া ছেকে ধরেছে পায়রাটাকে। দৃশ্যটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগল।

এক সন্ধ্যা বেলা কুরুলিয়া খালের কাছ দিয়ে হেটে আসছি সামনেই জেলে পাড়া। ঝুপসি অন্ধকার নেমে আসছে, কয়েকজন লোককে দেখলাম জটলা পাকিয়ে রয়েছে। এক বুড়ি খুব চিৎকার করছিল। সেখানে যেতেই অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। কয়েকটা মোরগ মরে আছে সব কটার মাথা মুচড়িয়ে ভাঙ্গা। হঠাৎ আমার টুরির পায়রার কথা মনে পড়ে গেল। পরীক্ষার তাড়া, তাই চলে আসি। সারা শহর সেদিন তোলপাড় মিশন স্কুলের দারোয়ানকে কারা যেন খুন করেছে। মিশন স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে দারোয়ান খুব প্রিয় ছিল। এই ঘটনায় মিশন স্কুলের ছেলে মেয়েদের মন খারাপ হয়ে গেল। এ ঘটনার পর আরও চার পাঁচটি খুন হয়ে গেল। আমাদের ছোট মফস্বল শহরে এই হত্যাকাণ্ড শীতল পরশ দিয়ে গেল।

সেটা ছিল অমাবস্যার রাত। সমস্ত শহর যেন অন্ধকারের ভেতর ডুবে আছে। কবরস্থানের পাশ দিয়ে আসছি। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার শুনি। বাঁদিকের শ্যাওড়া ঝোপের কাছ থেকে আসছে চিৎকারটা। একজন দৌড়ে পালায়। আমি তাড়াতাড়ি সেখানে যাই। মাঝবয়সী এক লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিঠে রক্তের ছাপ। হত্যাকারী পালিয়েছে। আমাদের শহরে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী হত্যাকারী সামনে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক খুন করেছে সে। ম্লান জ্যোৎস্নায় তার ছায়া মূর্তি দেখা যাচ্ছে। আমি "খুন, খুন" বলে চীৎকার করে উঠি। পথচারীরা দৌড়ে আসে। আমি হাত তুলে খাল পেরিয়ে যাওয়া খুনীকে দেখাই। সবাই তাকে ধাওয়া করেও ধরতে পারে না। কারণ সে নদীতে লাফ দিয়েছিল। একদিন পরে ভেসে উঠল তার লাশ। সবাই কুরুলিয়া নদীতে উপচে পড়ল লাশ দেখার জন্য। সে লাশটা আর কারও নয় সেটা আমাদের তিতাসের।

ডুয়েল

শিহাব আহমেদ

কলেজ নং ৪৩২৪
একাদশ শ্রেণী

ক্লান্ত পদক্ষেপে একটি ঘোড়া দাঁড়াল 'বণ্ড' বারের সামনে। আরোহী স্যামুয়েল ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটাকে বারের পিছনে আস্তাবলে নিয়ে বাঁধলো এবং পানি খেতে দেওয়ার জন্য আস্তাবলের রক্ষককে বললো। ঘোড়া আর স্যাম—দুজনই ক্লান্ত। দেখেই বোঝা যায় অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে।

শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপে স্যামুয়েল বারের দিকে এগোল। ঢোকার আগে লম্বা হ্যাটটা কপাল পর্যন্ত নামিয়ে নিল। পশ্চিমে এটাই রীতি। ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাসে, লুজিয়ানা এসব অঞ্চলের লোকেরা কোন বারে ঢোকার আগে সব সময়ই হ্যাট নামিয়ে নিজেকে কিছুটা আড়াল করতে চেষ্টা করে।

বারে ঢুকে একটা কোণের দিকে এগোল স্যাম। ও এমন একটা জায়গায় বসতে চায় যাতে সবটা বারে চোখ রাখা যায়। কোণের দিকের ফাঁকা একটা চেয়ারে বসে শান্ত গলায় বারটেণ্ডারকে বিয়ার দিতে বললো স্যাম। এরই মধ্যে বারের সব কয়টা চোখ ওর উপর স্থির হয়েছে। দৃঢ়ভাব, শান্ত কথাবার্তা, কোমরের হোলষ্টারে পিস্তল সব মিলিয়ে ওকে সবাই একটু অন্যভাবে বিবেচনা করছে। ওর সুগঠিত মেদহীন দেহও সবার দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় হয়ে ধরা দিল। দেখেই মনে হয়, কোন বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় এই ব্যক্তিকে।

কলস্ টাউনে রিচিই সব ব্যাপারে কৌতুহলী ও আগ্রহী। স্যামকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে ওর ভাল লাগল। বিয়ারে স্যাম চুমুক দিতেই ও উঠে এসে স্যামের উল্টো দিকের চেয়ার বসল। "তুমি কোথেকে? নতুন মনে হচ্ছে" স্যামকে প্রশ্ন করল।

"আমি স্যামুয়েল রিচার্ডসন। টপ সিটি থেকে এসেছি।"

"স্যামুয়েল রিচার্ডসন? কাল যার ডেভিড গ্রাউণ্ডে ডুয়েল লড়ার কথা, তুমিই কি সেই স্যামুয়েল?"

"হ্যা"

স্যাম টপ সিটির লোক। ও "এস আর" র‍্যাঞ্চের মালিক। ওর প্রতিপক্ষ লরিন্স হ্যান্স চায়—ওর র‍্যাঞ্চ ধ্বংস হোক। কারণ টপ সিটি এবং তার আশে পাশের এলাকার সবচেয়ে বড় সংগ্রহ স্যামের। স্যামের গরু ও ঘোড়া—উভয়ই উন্নত মানের। তাছাড়া ওর ঘোড়ার সংখ্যা হ্যান্সের ঘোড়ার প্রায় দ্বিগুণ। পশ্চিমে ঘোড়া দিয়েই র‍্যাঞ্চারকে বিচার করা হয়। হ্যান্স নিজেকে বড় বলে ভাবতে ভালোবাসে। তা জাহিরও করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ স্যামকেই বড় র‍্যাঞ্চার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

হ্যান্স স্যামকে অবদমিত করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছে। এমনকি দু'বার ওকে খুন করার প্লানও করেছিল। একবার টপ সিটিতে ঢোকার মুখে কয়েকজন আউট ল' ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছাড়ে। ওর বাম হাতে গুলি লাগে ও পড়ে গেলে ওরা মৃত ভেবে চলে যায়। পরে ওকে ওর মেয়ার ঘোড়াটি রাতের অন্ধকারে বাড়িতে নিয়ে আসে। আরেকবার 'লষ্ট ভেলে' উপত্যকায় অ্যাম করে ওকে মারতে চেষ্টা করে। অন্য এক লোককে স্যাম মনে করে ওরা গুলি করে মেরে রেখে যায়। কিছুক্ষণ পর স্যাম ও পথে আসার সময় কোহেনকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে। কোহেনের সাথে স্যামের উচ্চতা এবং চেহারার কিছু সাদৃশ্য ছিলো। তাছাড়া কোহেনের ঘোড়াটাও ছিল মেয়ার। টপ সিটিতে এসে স্যাম শুনল, একদল আউট ল' ওকে লষ্ট ভেলেতে মারার কথা বলে বেড়াচ্ছে ও কোহেনের মৃত্যুর কারণ বুঝল। ও বুঝল এ সবের হোতা হচ্ছে হ্যান্স।

শুধুমাত্র এই দুবারই নয় আরও কয়েকবার হ্যান্স ওকে সরাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ হ্যান্সের মেয়ে জুলি লরেন্স ওকে ভালবাসে গভীরভাবে। তেমনি স্যামও জুলিকে ভালবাসে অকৃত্রিম। তাই হ্যান্সের সব পরিকল্পনা ও জানতে পারে আগে ভাগেই।

এবারকার ঘটনা আলাদা। সেদিন ও হাডসন বারে বসে ছিল। এমন সময় কার্ল এসে বারে ঢুকল। ওকে দেখেই স্যাম বিরক্ত হয়ে উঠল কিন্তু মুখভাবে তা প্রকাশ পেলনা। কার্ল জুলিকে ভালবাসে। ভালবাসে না বলে ভালবাসতে চায় বলাই শ্রেয়। কারণ আজ পর্যন্ত ও জুলির আশে পাশে ঘেষতে পারেনি। কার্ল যে হ্যান্সের ধন সম্পদ লুটবার জন্য জুলিকে ভালোবাসতে চায় তা সহজেই সবাই উপলব্ধি করে। আর তাছাড়া কার্ল এ এলাকার সবচেয়ে কুখ্যাত ও নিকৃষ্ট আউট ল' কার্ল বারটেণ্ডারকে বিয়ারের নির্দেশ দিয়ে স্যামের দিকে ফিরল, "তুমি নাকি জুলির পেছনে ঘুর ঘুর করছ আজকাল?" কটাক্ষ করে কার্ল বললো।

"তাতে তোমার কি? সে তো অনেকদিন আগে থেকেই।"স্যাম তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে শান্ত স্বরে জবাব দিল।

"শোন, ওসব ধানাই পানাই ছাড়ো।"

"কেন? তুমি আমাকে বলার কে?"

"আমাকে হ্যান্স তোমার জন্য নিয়োগ করেছে। আর কেন? যদি আবারো ওপথ মাড়াও তাহলে তোমার খুলি উড়িয়ে দেবো, বুঝেছো?"

"বুঝেছি। তবে তোমাকেও এখন থেকে একটু মেপে পা ফেলতে হবে, মনে রেখো।'

কার্ল যে ধরনের উক্তি করেছে তাতে এটুকু না বলে পারল না স্যাম। কারণ পশ্চিমে পিঠটান দেওয়া মানেই কাপুরুষতা। বাঁচতে হলে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে। কাপুরুষের জায়গা নেই পশ্চিমে। যদিও স্যাম সহজে উত্তেজিত হয় না, তবু ওর আর জুলির মাঝে দেয়াল গড়ে তোলা ও সহ্য করতে পারে না। এর জন্যও হ্যান্সকেই মনে মনে দায়ী করল। ওর ভাবতে অবাক লাগে, বাবা মেয়েকে নিজের প্রতিপত্তি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গুটি হিসেবে ব্যবহার করছে। ও জানে, জুলিরও ওর মতোই অবস্থা। তবু ও আর কথা না বাড়িয়ে চিন্তিত হয়ে বার থেকে বাইরের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু কার্লের ডাক শুনে ওকে হাসতে হলো।

"আর শোন, পিস্তলবাজ হিসেবে নিজের নাম আর বলে বেড়িয়ো না, তাহলে বারোটা বাজাবো তোমার।"

এ কথা শুনে মাথার রক্ত চড়ে গেল স্যামের ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললো, "তুমি কি হঠাৎ করে পিস্তল বাজ হয়ে গেলে নাকি?"

"দেখতে চাও? ঠিক আছে, ডুয়েল হবে, রাজি?" সাথে সাথে জবাব দিল কার্ল।

স্যাম বুঝল উত্তেজিত হয়ে ও ভুল করেছে। কার্ল এটাই চাইছিল। ও বলার সাথে সাথেই কার্ল ডুয়েলের প্রস্তাব দিয়ে বসেছে। এখন রাজি না হয়ে উপায় নেই। অরাজি হওয়া মানেই কাপুরুষতা। আর পশ্চিমা সমাজে কাপুরুষ একেবারেই নিকৃষ্ট। চলাফেরা, খেলাধূলা এমনকি আলাপ চারিতায়ও সবাই কাপুরুষকে কথায় কথায় খোটা দেয়। তাছাড়া স্যাম টপ সিটির এক নম্বর র‍্যাঞ্চার। তাই ওর পক্ষে ডুয়েল আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। ও বললো "কোথায় এবং কখন লড়তে চাও?"

"পরশুদিন বিকেল তিনটেয়। ফলস্ টাউনের ডেভিড গ্রাউণ্ডে মৃত্যুর জন্য তৈরী থেকো।"

স্যাম চলে এল। স্যাম নিশ্চিত যে কার্লের কোন মতলব আছে। আউট ল'রা এমনিতেই দুর্বল মনের অধিকারী হয়। তারপর কার্লকে কেউ পছন্দ করে না। তাই কার্লের এতো নিশ্চিত হয়ে কথা বলাটা অস্বাভাবিক ঠেকলো ওর কাছে। র‍্যাঞ্চে ফিরে ও চুপচুপ শুয়ে পড়ল।

শেষ রাত। দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনে স্যাম জেগে উঠল। হাতে পিস্তল নিয়ে বাতি না জেলেই অন্ধকারে এক ঝটকায় দরজা খুলল যাতে শত্রু কেউ থাকলেও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। দরজা খুলতেই জুলি মেঝেতে পড়ে গেল। জুলির গলা শুনে স্যাম দ্রুত বাতি জালিয়ে ওকে বিছানায় বসাল। প্রথম কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলতে পারল না, শুধু চেয়ে থাকল চোখে চোখে। স্যামই নীরবতা ভাঙ্গলো—

"কি ব্যাপার? এতো রাতে?"

"তুমি নাকি কার্লের সাথে ডুয়েল লড়ছো আগামীকাল।" উৎকণ্ঠিত গলায় জুলির উদ্বেগ ঝরে পড়ল। ও হাঁপাচ্ছে।

"হ্যাঁ। কিন্তু তুমি হাঁপাচ্ছো কেন?"

"বাবা আটকে রেখেছিল। রাতে পালিয়ে এসেছি। প্লিজ, তুমি ডুয়েলে যেয়ো না। তুমি জান না স্যাম' কার্ল কত নীচ. নিষ্ঠুর। ও তোমাকে অবৈধভাবে হলেও হারাবে। তুমি যেও না প্লিজ।"

"জুলি, তুমি আমাকে জান। কাপুরুষ স্যামকে দেখতে কেমন লাগবে তোমার?"

"কিন্তু তুমি হারলে যে আমি তোমাকে চির-তরে হারাবো।" জুলির আন্তরিক সকরুণ কথা স্যামের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কিন্তু স্যাম শান্ত ও দৃঢ় স্বরে বললো, "তুমি আমাকে মাফ করো জুলি। আমাকে লড়তেই হবে। তবে কার্লের কুমতলব সম্পর্কে আমি ভেবে রেখেছি তুমি চিন্তা করো না।"

নির্বাক জুলি স্যামের দিকে এগিয়ে গেলো স্যামের দুই কাঁধে দুই হাত রাখলো। কোন মতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করল, "আমি জানতাম স্যাম, তুমি বীর এবং চিরদিন বীরই থাকবে। আমি অপেক্ষা করবো। গুডলাক।" বলেই দৌড়ে চলে গেল জুলি। কিন্তু অশ্রুর প্রথম ফোটা ফেলে গেল স্যামের পায়ে। তপ্ত অশ্রু স্যামকে শেল-বিদ্ধ করল। ও আপন মনে বলে উঠল "আমি জিতবো জুলি। জিততে আমাকে হবেই।"

এসব কথা ভাবতে ভাবতে স্যাম চেয়ার ছেড়ে বও বার থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সাথে রিচিও এল।

"তুমি কি ডেভিড গ্রাউণ্ডে আগে এসেছো কখনো?"

"এসেছি।"

"তাহলে ভাল। কিন্তু নতুন একটা বাড়ী তৈরী হয়েছে গ্রাউণ্ডের পশ্চিমে। অ্যাম্বুশ করার জন্য আদর্শের মতো জায়গা। তাই তোমাকে না বলে পারলাম না।"

"ধন্যবাদ", স্যাম বললো।

"এখন কোথায় যাবে?" রিচির প্রশ্ন।

"দেখা যাক।" স্যাম বলতে চায় না বুঝে রিচি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। স্যাম এগিয়ে গেল ডেভিড গ্রাউণ্ডের দিকে।

পরদিন। বিকেল তিনটা। ডেভিড গ্রাউণ্ডের উত্তর দিকের একটা বাড়ীর পেছন থেকে রাস্তায় নামল স্যাম। মাথায় লম্বা হ্যাট. ছ ফট উঁচু স্যাম দৃঢ় ভঙ্গিতে অনেকটা ধীর গতিতে ডেভিড গ্রাউণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল। তিনটে বাড়ী পেরিয়ে সামনে খোলা মাঠের অপর প্রান্তে কার্লকে দেখল স্যাম। একই গতিতে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে প্রফেশনাল ভঙ্গিমায় স্যামের দিকে এগিয়ে আসছে কার্ল। আশে পাশের রাস্তা-গুলি শূন্য হলেও বাড়ীর জানালাগুলি মাথায় ভর্তি। সন্ত্রাসী কার্ল পরাজিত হোক অনেকেই তা চায় আর স্যামের বিজয় অধিকাংশেরই কাম্য।

হাঁটতে হাঁটতে নতুন বাড়ীটার সামনে চলে এল, ডানে রেখে অনেকটা এগিয়ে গেল স্যাম। কার্ল আর ওর মাঝের দূরত্ব চল্লিশ গজ। ক্লোজ রেঞ্জ। ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নাই। যে আগে পিস্তল বের করবে তার জিত। দু'জনই চিতার মত সতর্ক। দু'জনের হাতই হাল্কাভাবে ঝুলে আছে কোমরের পাশে। দু'জন চেয়ে আছে

পরস্পরের দিকে নিষ্পলক চাহনি। কোন অভিব্যক্তি নেই কোন ভাব নেই। কেউই ভাবছে না। একটু পরেই একজনকে সরতে হবে দুনিয়া থেকে। ওদের মধ্যে দূরত্ব এখন পঁয়ত্রিশ গজ। স্যাম এখন নতুন বাড়ী থেকে পঁচিশ গজ দুরে।

কার্ল ওর এক সহচরকে নতুন বাড়ীটার পার্শ্ব দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়েছিল। কথাছিল, স্যাম যখন পঁচিশ বা তার কম দূরত্বে থাকবে তখন সেখান থেকে গুলি করে স্যামকে মারতে হবে। স্যাম গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর কার্ল কয়েকটা গুলি করবে দেখানোর জন্য। স্যাম আগেই একটা এমন কিছু আঁচ করেছিল ও ওর র‍্যাঞ্চের একান্ত সহকারী পিটারকে শেষ মুহূর্তে নতুন বাড়ীর পিছনে অন্য একটি বাড়ীর ছাদে দাঁড় করিয়েছিল।

স্যাম যখন নতুন বাড়ীটা থেকে পঁচিশ গজ দূরে তখন গুলির আওয়াজ শোনা গেল। পিটার কার্লের সহচর গুপ্ত ঘাতককে রাইফেল তুলতেই গুলি করল। বুক ভেদ করল বুলেট। গুলির শব্দের সাথে সাথে স্যামের দেহটা মৃদু ঝাঁকুনি খেল, কৃত্রিমভাবে, শিরদাঁড়া বেকে গেল। পা দু'টো গুলি খাওয়া মানুষের মতো শূন্য উঠে গেল। শূন্য থাকতেই স্যাম অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে হোলষ্টার থেকে পিস্তল বের করল এবং এক সেকেণ্ডের তিন ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই পর পর তিনটে বুলেট ঢুকিয়ে দিল কার্লের বুকে। কার্ল ওর সহচরের গুলিতে বিদ্ধ স্যামের দেহটা মাটিতে পড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। আচমকা স্যাম শূন্যে থাকতেই তিনটে গুলি লাগল কার্লের বুকে, অবিশ্বাস চোখ দুটি উল্টে দিয়ে মারা গেল কার্ল। প্রাণহীন দেহটা ধপাস করে মাটিতে পড়ল।

ডেভিড গ্রাউণ্ডের ধূলি স্যামকে এতক্ষণ বিজয় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছে। মাটি থেকে অলস ভঙ্গিতে উঠে স্যাম ধূলি ঝাড়ল গা থেকে। হ্যাটটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে ঝেড়ে ময়লা পরিষ্কার করে মাথায় দিল। পিটার আর রিচিকে আসতে দেখে সেদিকে এগোলো স্যাম। কয়েক পা এগোতেই বাম চোখের কোন দিয়ে একটা অগ্রসরমান ধূলির ঝড় লক্ষ্য করল। চমকে সেদিকে তাকালো স্যাম। ঘোড়ায় চড়ে আসছে জুলি, হাসছে। স্যামও হাসতে লাগল প্রাণখুলে। চেয়ে আছে দু'জন দু'জনের দিকে।

লাভ

এ. কে. এম. বাশার
কলেজ নং ২৮৪৬
অষ্টম শ্রেণী

সাগর সৈকতে দলবদ্ধ ওদের
দেখেছিলাম আমি ;
এসেছিলো ওরা এই বিশাল উপকূলীয় বনটিকে—
তাদের সৌন্দর্যের দ্বারা আরো অপরূপ করতে।
আরো প্রাণবন্ত করতে।
আজ কোথায় ওরা ? খুঁজে খুঁজে ফেরাই সারা,
দৃষ্টিগোচর আর হয় না,
শুধু কি তাই ? দেখেছিলাম এমন অনেক কিছুই যে—
নেই আজ আর এই বনে।
তবে কি কালের স্রোতে ভেসে গেছে ওরা ?
হেরে গেছে ওরাও
মৃত্যু নামক মহাকালের মহাবীরের হাতে ?

হায় মনতো বলে —
এই পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতার করাল থাবায়
স্তব্ধ হয়েছে ওরা,
স্তব্ধ হয়েছে মানুষ নামক নির্মমতার কাছে।
আমরা যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব
তাইতো ওদের বিদায় নিতে হয়েছে,
হয়েছিলো অতীতে, হবে যে ভবিষ্যতেও।
ওদের বিদায়ে সৌন্দর্যহীনা হয়েছে বন বনানী
হয়েছে পৃথিবী।

আর মানুষের লাভ ?
লাভ শুধু এটুকুই—
মানুষ নামধারী আমরা ব্যর্থ হয়েছি
ভবিষ্যতের মানব সন্তানের কাছে
সেই সৌন্দর্যটুকু দিয়ে যেতে।
আর আমরা জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা সভ্যতার স্থায়িতের জন্য,
খুঁজে চলছি—
পাশবিকতার মাধ্যমে নিষ্ঠুর সেই —
অপরূপ সৌন্দর্যের ধ্বংসকে—

দরিদ্র

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
কলেজ নং ৪২৯৯
একাদেশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

দিনভর অকুণ্ঠ পরিশ্রমেও যারা
পায় না অন্ন,
উচ্চবিত্ত বিলাসীরা তাদের সর্বস্ব নিতে
করে না কার্পণ্য।
প্রখর রৌদ্রে ঘামে ভিজে বৃষ্টির ধারায়
কাজ করে যারা,
মহানগরীর জীর্ণ বস্তির অন্ধকারে
আবদ্ধ তারা।
রোগ শোক, দুঃখ তাপে তারা
বলে বিধাতায়
মোদের কেন করেছ সৃষ্টি তব
সুন্দর এ ধরায়,
কত শাসক-শোষক এলো জীবন
বদলায় না ওদের
তারাই পাচ্ছে ভুরি ভুরি প্রচুর
আছে যাদের।
তাই মেহনতি দরিদ্রের উন্নতির জন্য
এগিয়ে আস সকলে,
শোষিতের পক্ষে লড় এসে একই
পতাকা তলে।
শাসক-শোষকের পৈশাচিক হাসি
রোধকরে দিয়ে,
ভাত, কাপড়, শিক্ষা নিয়ে তারা যেন বাঁচে
নতুন জীবন নিয়ে।

শান্তির অন্বেষণে

এইচ. এম সরোয়ার আলম
কলেজ নং ৪১৩৭
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

মানব সভ্যতার আদি যুগ থেকে সকল ধর্মের মহাপুরুষগণ মানুষের শান্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্যে নিজেদের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন বারবার। এর পরিচয় পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থে বিধৃত— কোরআনে, বাইবেলে, ত্রিপিটকে, গীতা-উপনিষদে...। মানষুকে সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। শান্তি প্রতিষ্ঠাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। মানুষ যখন শান্তিকে তার নিজ হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়েছে। ইতিহাস এর স্বাক্ষী।

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে জীবন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, শিল্পের প্রসার হয়েছে, সমাজ কাঠামো নানা জটিল রূপ নিয়েছে। বিজ্ঞান আমাদের সামনে যে মারাত্মক সব মারণাস্ত্র তৈরী করার সুযোগ করে দিয়েছে তার জন্যেই আরো কল্যাণ চিন্তা শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আজ এত জরুরী হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান শুধু সমরোপকরণ তৈরী করে মানুষের সুখ ও শান্তিকে বিপন্ন করছে না, আধুনিক জীবন ব্যবস্থার মধ্যে আরো নানা অবাঞ্ছিত বিষয়কে নিয়ে এসেছে। এক দিকে আমরা আনবিক যুদ্ধের সম্ভাবনায় গোটা বিশ্বের ধ্বংসের কথা ভেবে শঙ্কিত অন্যদিকে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের কলুষতা, স্নায়ু সম্পর্কিত নানা রোগের আবির্ভাব নিউরোসিস, ড্রাগ-এ্যাডিকশান ও নৈতিক মূল্যবোধের বিপর্যয় জনিত সমস্যাবলীতে বিচলিত।

বর্তমান বিশ্ব পটভূমিতে মানবকল্যাণ সম্পর্কে ভাবতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্নটি বড় হয়ে অনেকের মনে দোলা দেয় তা হ'ল কেমন করে আগামী বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিরোধ করা যাবে? যে ভাবে অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে, সমরাস্ত্র সঞ্চয় করছে উন্নত বিত্তশালী ক্ষমতাবান রাষ্ট্রকুল, যে ভাবে নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার ও তার ত্রুটিহীন নিখুঁত ব্যবহার যোগ্যতা সুনিশ্চিত করার অক্লান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে বিভিন্ন দেশে। তাতে করে শান্তিকামী নিরীহ সাধারণ নাগরিকবৃন্দ অনেক সময় চরম বিভ্রান্তি বোধ করে। নিরস্ত্রীকরণ ষ্ট্র্যাটেজিক আর্মসের সীমিত করণ, হেলসিঙ্কি সম্মেলন যুদ্ধের জন্যে আণবিক অস্ত্র প্রসার না করার চুক্তি টি,টি,বি,টি, চুক্তি, আণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি (NPT) টলাটেলোলকো চুক্তি, এ,বি,এম চুক্তি, প্রতিরক্ষা খাতে শতকরা দশভাগ ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব, পরস্পরের অস্ত্র সম্ভার পরিদর্শন, প্রতিবছরে একবার দুই পরাশক্তিদ্বয়ের নেতাদের পরস্পরের সাথে শীর্ষ বৈঠক প্রভৃতি সম্পর্কে নানা আলোচনা মাঝে মাঝেই আমরা শুনি কিন্তু এর যথার্থ বাস্তবায়ন সম্পর্কে উল্লাসিত হবার মতো ঘটনা বা ঘটনা প্রবাহের গতি ধারা এখনো লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বৃহৎ রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই আকাঙ্ক্ষিত সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, প্যালেষ্টাইন, ইথিওপিয়া ও আফগানিস্তানের ন্যায় অনেক জায়গার কথা ভাবলে সেখানে দেখতে পাই সুখ শান্তি ও কল্যাণের মারাত্মক বিপর্যয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব শান্তিকে অক্ষুণ্ন রেখে মানবকল্যাণের সম্ভাবনাকে প্রসারিত করার চিন্তা-ভাবনা প্রথম মহাযুদ্ধের পর একটা বাস্তব পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। তার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় লীগ অব নেশান্‌স্। মোটামুটি একই মৌলিক চিন্তাধারা প্রসূত প্রতিষ্ঠান আমরা পাই পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর United Nations-এ। কিন্তু এখানেও বিপর্যয় বর্ণবাদী

ধর্মবাদী ও পরাশক্তিগুলো নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে বিশ্ব মানবকল্যাণের চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

নোবেল শান্তি পুরস্কার। Red cross এবং জাতি সংঘের নিম্নোক্ত কল্যাণমূলক সংস্থা WHO, FAO, UNICEF, UNESCO, UNRRA প্রভৃতি সংগঠন প্রশংসনীয় কাজ করেছে এবং করে চলেছে। বিরাট জনগোষ্ঠী অক্ষর জ্ঞান বর্জিত অজ্ঞানতার তিমিরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চরম দারিদ্রের নিষ্পেষণে পীড়িত, পুষ্টিহীনতা ও নানা রোগে আক্রান্ত, চিরক্ষুধার্ত, চিকিৎসার সুযোগ বঞ্চিত উপযুক্ত বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবে নিদারুণ ভাবে লাঞ্ছিত। অথচ এরই পাশাপাশি অনেক দেশে জীবন যাত্রার মান প্রচুর উন্নত। পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্যে সেখানে সময় সময় উদ্বৃত্ত কৃষি দ্রব্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে কিংবা আগুনে পুরিয়ে ফেলতে হয়।

আন্তর্জাতিক সমর বিদ্যা সংক্রান্ত ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ই অত্যন্ত দ্রুত তাদের সর্বাধুনিক পারমাণবিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। বিশ্বে রয়েছে ৫০,০০০ আণবিক বোমা, মজুত আণবিক অস্ত্রের মোট-বিস্ফোরক শক্তি প্রায় দশ লক্ষ হিরোশিমা-বোমার সমান। হিরোশিমায় বিস্ফোরিত বোমার ক্ষমতা ছিল ১৩ কিলোটন (এক কিলোটন-১০০০ টন প্রচলিত উচ্চ বিস্ফোরক বা টি,এন, টির সমান)। বস্তুতঃ আধুনিক প্রযুক্তির আনুকূল্যে একটি অস্ত্র দ্বারা এক নিমেষে ইতিহাসের পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধে ব্যবহৃত তাবৎ প্রচলিত অস্ত্রের চেয়েও বেশি ধ্বংস শক্তি সৃষ্টি সম্ভব। বর্তমানে প্রচলিত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ভূমি, সমুদ্র ও আকাশে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী ব্যবহৃত সকল ঐতিহ্যিক অস্ত্র। ভূ-ভিত্তিক অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একজন সৈনিকের রাইফেল থেকে শুরু করে কামান, রকেট, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সাঁজোয়া গাড়ী। রণতরী, বিমানবাহী জাহাজ, ডেষ্ট্রয়ার, ক্রুজার প্রভৃতি নৌযান ও ডুবোজাহাজে বসানো অস্ত্র হচ্ছে সমুদ্রভিত্তিক অস্ত্র। বিমানের মধ্যে রয়েছে ছোট জঙ্গী বিমান থেকে অতিকায় বোমারু, যার অন্তর্ভুক্ত জঙ্গী বোমারু, হেলিকপ্টার, অনুসন্ধানী বিমান প্রভৃতি। লক্ষ্যভেদে অভূতপূর্ব মাত্রায় কার্যকর, নতুন ধরনের প্রচলিত অস্ত্রও তৈরী হচ্ছে। যেমন সুনিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত গোলা। প্রচলিত অস্ত্র বিষয়ক জাতি সংঘের সাম্প্রতিক নিরীক্ষা অনুযায়ী প্রচলিত অস্ত্রের বিশ্ব-ভাণ্ডারে রয়েছে ১,৪০,০০০ যুদ্ধট্যাঙ্ক; ৩৫,০০০ -এরও বেশী জঙ্গী বিমান; ২১,০০০-এরও অধিক হেলিকপ্টার এবং ১১,০০০ বড় ধরনের ভাসমান যুদ্ধ জাহাজ। প্রচলিত অস্ত্র ও সেনাবাহিনী বাবদ ব্যয়িত হয় বিশ্বের সামরিক ব্যয়ের আনুমানিক প্রায় চার পঞ্চমাংশ। হিসেবে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৫০টি লড়াই ঘটেছে প্রচলিত অস্ত্র দিয়ে। এই সংঘর্ষে মৃতের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। তবে প্রচলিত নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত জাতি সংঘের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ঘটেছে প্রায় ২০,০০০,০০০ মৃত্যু। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসেবে অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে বিশ্বে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮০০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ১৫ লক্ষ ডলারের ও বেশী। স্থির মূল্যমানে এটা ১৯৬০ সালের ব্যয়ের দ্বিগুণেরও বেশী এবং ১৯৪৯ সালের ব্যায়ের প্রায় চারগুণের সমান। ১৯৮৩ সালে সকল উন্নয়নশীল দেশকে প্রদত্ত সমুদয় সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৪.৩ বিলিয়ন ডলার এবং এটা মাত্র ১৫ দিন ১৫ ঘণ্টার বিশ্ব সামরিক ব্যয়ের সমান। জাতি সংঘের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এই ঝোঁক অব্যাহত রইলে ১৯৯০ সালের অনেক আগেই ডলারের বর্তমান মানে বিশ্ব সামরিক ব্যয়, ১০০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে, চাইকি তা' ছাড়িয়ে যেতে পারে।

'তারকা যুদ্ধ' ও অন্যান্য অভিনব যুদ্ধ পরিকল্পনা বিশ্বের জনগোষ্ঠীর জন্যে এক অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। বিভিন্ন কল্যাণ মুখী প্রতিষ্ঠানগুলোও প্রায়শঃ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশ্ব মানবকল্যাণ সম্পর্কে যাঁরা ভাবেন তাঁদের কাছে এসব সংবাদ চরম উদ্বেগ বহন করবে অবশ্যই। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে মানুষের শান্তি, সুখ ও নিরাপত্তার অবলুপ্তির আকাঙ্ক্ষাই একমাত্র উদ্বেগের ক্ষেত্র নয়। সারা দুনিয়ায় জন-সংখ্যার বিস্ফোরণ; সেই বিপুল জন সংখ্যার জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী ঘাটতি এবং তার ফলে বিশ্বজোড়া খাদ্যভাব অপুষ্টি জনিত রোগ মহামারী ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্পের প্রসার এবং তার ফলে বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের গ্যাস, তেল, কয়লা, লোহা, সীসা, তামা ইত্যাদি দ্রুত ক্ষয় ও নিঃশেষিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা; ব্যাপক শিল্পায়ন এবং মোটর-গাড়ী সহ বিভিন্ন যন্ত্রচালিত যানবাহন ব্যবহারের ফলে নানা ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস ছড়ানো এবং একারণে পরিবেশ দূষিত হওয়া এবং জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনা এগুলো ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি উন্নয়নের মাত্রার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে প্রয়োজনীয় human institution ও social institution গড়ে তুলতে আমরা কতটা সক্ষম হয়েছি, হচ্ছি বা হতে পারবো তা নিয়েও অনেক চিন্তাশীল সমাজ-তত্ত্ববিদরা প্রশ্ন তুলেছেন। ইতিমধ্যে আমরা শেষোক্ত ক্ষেত্রে অনেক ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছি। বর্ণ বিদ্বেষজাত সমস্যা, আত্মহত্যা, মাদকদ্রব্যের অতি ব্যবহার, মানসিক রোগ এবং সুস্থ মূল্য-বোধের অবক্ষয় প্রভৃতি আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

একটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত গ্রন্থিবদ্ধ সিস্টেম হল মানব সমাজ। শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্য দিয়ে তার সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়তো সম্ভব নয়, কারণ কোন একটি দিকের প্রয়াস শুধু সেই বিশেষ দিকটির সমস্যা মোচন করেই ক্ষান্ত থাকে না, অন্যান্য বিষয়ের উপরও তার অনিবার্য প্রভাব ও পারমাণবিক শক্তির অধিকতর ব্যবহার প্রসঙ্গে ধরা যাক অর্থনৈতিক উন্নতিতে এর অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু ফলে বিপদ আরও বহুগুণে বেড়ে যেতে পারে।

ক্রমেই সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্বকে প্রেক্ষাপটে রেখে সঠিক সুসমন্বিত ব্যাপক কার্যক্রম অবিলম্বেই গ্রহণ না করলে পৃথিবীসহ গোটা মানবজাতি চরম দুর্যোগাক্রান্ত, আমাদের জীব-দ্দশায় না হলেও আগামী দু' জেনারেশনের মধ্যে অবশ্যই। খাদ্য উৎপাদন ও শিল্পায়নের বিকাশের একটা সীমা আছে। সেই সীমাকে দৃষ্টির মধ্যে রেখে বিশ্বের উন্নতদেশগুলোতে ক্রমাগত আরো অর্থনৈতিক গ্রোথের পরিকল্পনা না করে সেখানে একটা যুক্তি সংগত কল্যাণকর অবস্থা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা চালানো উচিৎ। উন্নয়নশীল দেশ-গুলোকে আরও কার্যকর সহায্য প্রদান করা উচিৎ গোটা বিশ্বের স্বার্থে মানবজাতির স্বার্থে। এ সম্পর্কে একটি গবেষণার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

"Short of a world effort todays already explosive gaps and inequalities will continue to grow larger. The out come can only be disaster, whether due to the selfishness of individual countries that to act purely in their own interests, or to a power struggle between the developing and developed nations. The world system is simply not ample enough nor generous enough to accommodate much longer such egocentric and conflictive behaviour by its inhabitants." (The Limits to Grouth P. 195)

পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই যে অবহিত নয় তার প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করি জাতিসংঘসহ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বিভিন্ন রিপোর্টের মাধ্যমে। সবচেয়ে অসন্তোষজনক যা' তা হ'ল আলাপ-আলোচনা যতটা হয় সত্যিকার কাজ তার তুলনায় প্রায় কিছুই হয় না। বিশ্ব মানবকল্যাণ ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠার জন্যে এটা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক সবক'টি ক্ষেত্রেই গোটা বিশ্বকে পটভূমি রেখে বাস্তব সুষমণ্ডিত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ যাতে ক্ষতিকর প্রবণতাগুলো রোধ করা যায়, কল্যাণকর সম্ভাবনা দ্বার উন্মোচিত করা যায় এবং আনন্দময় সচ্ছল সুখী জীবন সুনিশ্চিত করা যায় পৃথিবীর সব মানুষের জন্যে।

সাম্প্রতিককালে বিশ্ব মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠা কল্পে যে সব যৌথ প্রয়াস এবং সাংগঠনিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে তার কথা আমরা কমবেশী সবাই জানি। সাংগঠনিক উদ্যোগ ও যৌথ প্রয়াসের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা স্মরণ রেখেও বলা দরকার যে, ব্যক্তিগত মানবিক সম্পর্কের বিষয়টি কোন অবস্থাতেই উপেক্ষা করা যায় না। প্রীতি-ভালোবাসা, সহৃদয়তা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তা সমষ্টিগত মানুষের সঠিক ও বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে মূল্যবান। অর্থাৎ cause কে মাত্রাতিরিক্ত অন্ধ আনুগত্য দান করতে গিয়ে আমরা যেন মানবিক সম্পর্কের মূল্য বিস্মৃত না হই। ই. এম, ফস্টার লিখেছেন,

"I hate the idea of causes, and if I had to choose between betraying my country and betraying my friend, I hope I should have the gats to betray my country."

মানব জাতি তথা মানুষ চায় তার শাশত অধিকারকে এ পৃথিবীর বুকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু যে সমাজে লুণ্ঠন, হত্যা, পাশবিকতা নিত্য ঘটনা, মানুষ কর্তৃক মানুষ লাঞ্ছিত হয়, সমাজ ও সমাজপতিদের দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হয় সেই সমাজে মানুষের জন্মগত অধিকারকেই লঙ্ঘন করা হয়। আর যদি হত্যা, লুণ্ঠন, শোষণ, বঞ্চনা, চুরি এবং মানুষের কাল্পনিক সমান অধিকার ও কল্যাণ সুদৃশ্য মোড়কের আড়ালে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে জঙ্গলে পশুকুলের সাথে Survival of the fittest নীতির সাথে তার পার্থক্য কোথায়? মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও সম অবিচ্ছেদ্য অধিকার সমূহের স্বীকৃতি বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়-বিচার ও শান্তির ভিত্তি। মানবিক অধিকার সমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা মানব জাতির বিবেকের পক্ষে অপমান জনক বর্বরোচিত কার্যকলাপে পরিণতি লাভ করছে এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে এমন একটি পৃথিবীর সূচনা ঘোষিত হয়েছে যেখানে মানুষ বাক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় ও অভাব থেকে নিস্কৃতি ভোগ করবে। চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে মানুষকে অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করা না হলে মানবিক অধিকার সমূহ অবশ্যই আইনের শাসনের দ্বারা সংরক্ষিত করা উচিত। কেননা পৃথিবীর কোন সমাজই মানব অধিকারের ও কল্যাণের সংজ্ঞা দিতে অভ্যস্ত নয়। তারা শুধু অধিকার বঞ্চনা ও কল্যাণ হত্যার সংজ্ঞা দিতে পারবে প্যালেষ্টাইন, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইথিওপিয়ার মত হাজারও প্রামাণ্য চিত্রের মাঝে। মানুষের শ্বাসত শান্তি ও অধিকারের হত্যাকারীদের মুখে 'মানবাধিকার' জেনারেল মার্কুইস-দ্য গালিফ আর 'শান্তির কবি' বেঞ্জামিনের হত্যাকাণ্ডের মতোই ক্ষমাহীন ঔদ্ধত্য।

দস্যি ছেলে লক্ষ্মী হল

রায়হান লতিফ
কলেজ নং ৩৪২৮
পঞ্চম শ্রেণী

দুষ্টু আমি দস্যি আমি
করিনা কাউকে ভয়,
মা সারাদিন খোদাকে বলেন
ছেলেটি যেন লক্ষ্মী হয়।
দুটি ভাইয়ের একটি বোন
সারাদিন মারি ইচ্ছা মতন,
মা রাগ করেন, কখনও বা মারেন
কখনও ধরেন কান,
আব্বু শুনলে মাকে উল্টো বকে দেন।
এই তো মজা! এই তো মজা!
বোনটিকে দেই আরো সাজা।
চিমটি কাটা, কান টানা, চুল টানা,
বোনটি আমার বেজায় ভাল
কোনটিতে তার নেইকো মানা।
চোখ দুটি তার ছল ছল,
করছে পানি টলমল।
এই দেখে বলি মাকে
করবোনা আর দস্যি পনা,
এখন থেকে তোমার ছেলে
হবে অতি লক্ষ্মী সোনা॥

গোলাপ ও মাটি

মোঃ মহীবুর রহমান
কলেজ নং ২৮১৮
অষ্টম শ্রেণী

অহংকারের সাথেতে কহে গোলাপ,
"ওহে মাটি ভাই
মোর নীচে থাকো তুমি, পাও আঘাত
কত কই তাই।"

দুঃখের সাথেতে মাটি কহে,
"একি বলে হায়।
যার পরে জন্ম তার
তারে ভুলে যায়।"

গোলাপ বলে, "সযতনে থাকি আমি
কত শোভা মোর,
ওরে মাটি কালোবর্ণের তুই
কি শোভা আছে তোর?"

মাটি বলে, "মোর পরে দাঁড়িয়ে তুই
করলি অহংকার।
এরে গোলাপ, বিহনে আমার
ঠাঁই তব কোথা, বল---দাঁড়াবার।"

প্রকৃত শিক্ষিত কে

এ. কে. এম সিরাজউদ্দীন আহমেদ
কলেজ নং ৩০১৮
দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

মনো বিজ্ঞান অনুযায়ী নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে পরিপূর্ণ সংযোগ ও সংহতি স্থাপন করে উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানুষকে কলা-কৌশল আয়ত্ব করতে হয় তাই শিক্ষণ। ফলে শিক্ষণের দ্বারা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা সম্পূর্ণ নূতন হতে পারে বা তার পূর্ব আচরণের উন্নত রূপ হতে পারে। কোন বিষয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে সে বিষয়ে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা জন্মে।

উপরোক্ত এই প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ শিক্ষাকে কাজে লাগানোটাই হল শিক্ষিতের পরিচয়। শিক্ষিত মাত্রই শিক্ষাকে কাজে লাগাবে। তার আচরণ ও বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতিফলন ঘটবে।

কিন্তু বর্তমানে আমরা একটা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চলেছি। শিক্ষিত বলতে আমরা শুধু ডিগ্রীধারী মানুষকে বুঝি। কিন্তু বর্তমানে হাজার হাজার ডিগ্রীধারী মানুষ আছে যারা দুর্নীতি, চোরাচালান ও সমাজের যাবতীয় কুকর্মে লিপ্ত। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তক ও প্রাসঙ্গিক পুস্তক যা ঐ ডিগ্রীধারী লোকটি শিক্ষণ করেছিল তাতে নিশ্চয় তা লেখা ছিল না। ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা দেখতে চাইলে আমাদের বিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকাই। দেখা যায় যারা প্রথম বা দ্বিতীয় পজিশন পায় বা ভালো ছাত্র বলে পরিচিত হয় তারা দুর্বল ছাত্রদের কখনো নোট বা অন্যান্য পড়ালেখায় সহায্য করে না। কিন্তু বইয়ে তো বলা হয়েছিল বিদ্যা দান করলে বাড়ে বৈ কমে না। ঐ শাস্ত্র ঐ first boy ও পড়েছিল। কিন্তু কৈ তার প্রতিফলন তো তার মধ্যে কেউ দেখতে পায় না। তবে সে কি শিক্ষিত? ইসলামিয়াত একটি পাঠ্য বিষয় আমাদের বিদালয়গুলোতে চালু আছে। ইসলামিয়াতের পাঠ্য বইয়ে অনেক নৈতিক আদেশ উপদেশ দেওয়া আছে। পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য একটা বিষয় যা এখানে ভালোভাবে লেখা থাকে। এই বিষয়ে কোন কোন ছাত্র সর্বোচ্চ নাম্বার পায় পরীক্ষায়। কিন্তু বাস্তবে সেই ছাত্র ঐ উপদেশাবলী মাতা-পিতার ক্ষেত্রে কতটা পূরণ করে? অভিভাবকরা বর্তমানে তাদের সন্তানদের ধারণা দেন যে বোর্ডের পরীক্ষায় ৮৫০ নম্বর পেলেই ভালো ছাত্র বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু আদতেই তার ৮৫০ নম্বর পাওয়া কতটুকু সার্থক তা কি কখনো আমরা দেখি? বইয়ে আমরা পড়ছি কোন কাজই ছোট না। আমাদের শিক্ষিত অভিভাবকরাও এই কথা হয়তো মুখে আওড়ান। কিন্তু আজ আমরা যারা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে পড়ছি আমাদের অভিভাবকরা কি কখনো দিবেন আমাদেরকে ট্যাক্সি চালাতে, হোটেল বয়-এর কাজ করতে? যদি না দেন তবে এই বই পড়ে কাজের গুরুত্ব জানার কি দরকার? কি প্রয়োজন এই অপ্রয়োগকৃত হয়ে?

সেদিন বাস থেকে নেমে ফুটপাতে এক বৃদ্ধা মহিলাকে দেখলাম যিনি প্রচণ্ড রোদের মধ্যে কুড়ানো শুকনো পাতার বোঝা পিঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অতি কষ্টে। আমরা তথাকথিত শিক্ষিত ও অনেক ছাত্রই সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কই আমরাতো কেউই ঐ বৃদ্ধাকে সহায্য করিনি। কিন্তু বইয়েতো আমরা পড়েছিলাম যে প্রতি-দিনই কারো কিছু না কিছু উপকার করা উচিত। আসলে এই কথাগুলো আমরা বেশী নাম্বার পাবার জন্যই শিখে থাকি।

মানুষকে শিক্ষিত করার অনেক প্রচেষ্টা আদর্শবান মানুষেরা করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্যকার মামুনর রশীদের একটা কথা মনে পড়ল। তাঁর মতে সমাজের ইনটেলেকচুয়্যাল নামে পরিচিত জনেরা মঞ্চে আসেন সমাজ পরিবর্তন-মূলক নাটক দেখেন। কিন্তু ঘরে গিয়েই হয়ত

নিজের গৃহ পরিচারিকার উপর নির্যাতন করেন। অথচ নাটকে তা দেখে তাঁরা কাঁদেন। 'High thought' এর এইসব নাটক দেখে তাঁরা সমাজে বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত। তাঁরা শিক্ষিত, কিন্তু ব্যক্তিগত ও কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কতটুকু শিক্ষিত ?

বর্তমান শিক্ষিত-এর সংজ্ঞা যা সবার মুখে শোনা যায় সে প্রসঙ্গে বনফুলের একটা গল্প মনে পড়ল যা দ্রুতপঠনে ক্লাশ সেভেন-এ পড়েছিলাম। গল্পটা হলো—লেখক লঞ্চ ঘাটে গেলেন এক কুলির মাথায় বোঝা চাপিয়ে। কিন্তু পরে কুলিকে পয়সা দিতে গিয়ে দেখলেন মানিবেগ উধাও। তিনি কুলিকে চিনতেন। তিনি কুলিকে তাঁর অসুবিধার কথা জানাতেই কুলি সলজ্জভাবে পরে পয়সা নিবে বলে জানালো। লেখক এতে আশ্বস্ত হলেন এবং লঞ্চে এক তথাকথিত বিদ্যা-অর্জনকারী শিক্ষিতজনের পাশাপাশি চলতে লাগলেন পত্রিকা পড়ত পড়তে। পাশের লোকটি তখন তাঁর কাছ হতে পত্রিকাটুকু চেয়ে নিয়ে পড়তে লাগলেন এবং জোরে জোরে লেখককে পড়ে শোনালেন যে অশিক্ষিতদের জন্য দেশের ভরাডুবি হল। ততক্ষণে এককাপ চা তিনি খেয়েনিলেন। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরেও লেখককে চা সাধলেন না। এবং নামার সময় পত্রিকাটুকু লেখক আর ফেরত দিলেন না। এদিকে লেখককে লঞ্চঘাট থেকে সেই কুলি আবার নিজের পয়সা খরচ করে বাড়ীতে খাবার ব্যবস্থা করে দিল। তখন লেখক কুলিকে একটা চিঠি দিয়ে কাছেই তাঁর এক ভাইয়ের বাসায় পাঠালেন তার পাওনা টাকা নেওয়ার জন্য। পরদিন সকালে কুলি এসে দেখা করল লেখকের সাথে এবং জানালো যে লেখক তাকে তার পাওনার চেয়ে আড়াই টাকা বেশী দিয়েছেন। তাই তার পাওনার অতিরিক্ত টাকা সে লেখককে ফেরত দিতে এসেছে। লেখক তখন এই মহৎ ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনে তাকে বখশিষ দেওয়ার দুরাশা ত্যাগ করলেন। এখন আমার কথা হচ্ছে তাহলে প্রকৃত শিক্ষিত কে ? ঐ পাশের বিদ্যা-অর্জনকারী লোকটি না কুলি, কে ?

এসো রক্ত-সত্তা গড়ি

শিহাব আহমদ
কলেজ নং ৪৩২৪
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

সাগরঝঞ্ঝা জলোচ্ছাসে মানব বিপর্যস্ত
হে তরুণ, এগোও ধরো হাল ;
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ মাঝে তরী টাল মাটাল,
যাত্রীর ভারে কুঁজে পিঠ, পদক্ষেপ সন্ত্রস্ত।

চৌদিকে উদ্যত ফণা সর্পের, মানবখেকো গাছ
চেয়ে আছে নির্মম ভ্রূকুটি হেনে, বেহালার
ছিঁড়ে গেছে তার, থেমে গেছে গান বনযাত্রার,
ব্যাঘ্র যেমন গাভীর, রিপু আমাদের পাছ।

কল্পিত পক্ষীরাজ, আলাউদ্দীনের চেরাগ
চড়েছি অনেক, ঘষেছি বহুবার
উজ্জ্বল পাথর, ক্ষয়ে গেছে, ছিল ক্ষুরধার,
'হজরে আসাওয়াদ' সম মনে পড়েছে কালো দাগ।

চৌদিকে বাধার প্রাচীর টপকাব গিরিশির,
লঙ্ঘিব দোযখ দেয়াল, তুষার সমুদ্রের
জড়তা ভেঙ্গে আনিব উদ্দাম ফের,
ছিন্নিব তব গ্লানি বিষাদের নীড়।
চলো একযোগে মোরা বাজাই ঢক্কা রণের
তারুণ্য চঞ্চল, তারুণ্য উজ্জ্বল-নির্মল,
আমরা তরুণ, বীরবাহু, বীরবল,
হাতে সক্রেটিসের বিষ পাত্র, ঘোষি আমরণ পনের।

শত নদী শিরা উপশিরা যে দেহের,
প্রেমের বুকে আমূল ছোড়া বসিয়ে,
উন্মাদ হই নজরুলের বজ্র নিয়ে,
স্মরি শহীদের রক্তেরে, গড়ি সত্তা এদেশের।

ছয় ঋতু

চৌধুরী ফয়জুর রব
কলেজ নং ৪৩২২
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

প্রচণ্ড দাবদাহ, সাথে তার উত্তাপ
এল এই গ্রীষ্ম, নিয়ে প্রচণ্ড প্রতাপ।
মেঘহীন আসমান, আগুন বরষে
কৃষকের হাহাকার ক্ষেতে পানি চায় সে।

প্রাণভরা চাওয়াটাকে করে দিয়ে ধন্য—
বর্ষার আগমন জলে জলে পূর্ণ।
ধান পাট করে চাষ, হাসি মুখ ধরে না
ঝর ঝর বৃষ্টির বাজনা যে থামে না।

ভিজা ভিজা দিনগুলোর অবসান ঘটিয়ে
শরত আসে যেন হাসিমুখ লুটিয়ে।
সাদা বক উড়ে যায় মেঘ-ভেলা চড়তে
কাশবন থোকা থোকা চায় সেটা ধরতে।

গোলা ভরা ধান আর কৃষকের গান
হেমন্ত নিয়ে আসে এ দুইয়ের বান।
রঙধরা পাকা ধানের সোনালী ছড়ায়
হেমন্ত সারাবেলা দোলা দিয়ে যায়।

কুয়াশার চাদরে শরীরটা ঢেকে
শীত আসে হেমন্তর বিদায়ের ফাঁকে।
ঘরে ঘরে রস আর পিঠা হয় খাওয়া
বয় শুধু উত্তরের হিমেল হাওয়া।

আগমনী রব আসে ঋতুরাজ বসন্তের
ফুল ফোটে পাখী গায় প্রকৃতি রাজ্যের।
থোকা থোকা ফুল, তার মধুর সৌরভে
ভোমরারা আসে ছুটে গুণ গুণ রবে।

বিশ্বের আশ্চর্যতম রহস্য

মনিরুজ্জামান
কলেজ নং ৪২৬৭
একাদশ শ্রেণী (মানবিক)

এরা সব যায় কোথায় ?

কাল্পনিক কিছু নয়—আটলান্টিকের একটা বিশেষ এলাকায় পৌঁছলেই আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছে নাবিকরা, সেই কলম্বাসের সময় হতে আজও আশ্চর্য আলোকের গোলক দেখা যায়। কথা নেই, বার্তা নেই হঠাৎ ক্ষেপে উঠে সাগর। বিশাল সব ঢেউ গিলতে আসে জাহাজ। সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড ঘুর্ণিপাক আর জল ও স্তম্ভে পাগল হয়ে যায় কম্পাসের কাঁটা। নষ্ট হয়ে যায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। দিক হারিয়ে ফেলে নাবিক ও বৈমানিক। এইসব ঘটনা ঘটছে আটলান্টিক মহাসাগরের একটি জায়গার নাম বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। এই ট্রায়াঙ্গল এর ভিতরে শ' তিনেক প্রবাল দ্বীপ আছে। এগুলো বেশীর ভাগ জনবসতি হীন। পুরানো পুঁথি ঘাটলে জানা যায় সেকালের সাদা দাড়িওয়ালা অভিজ্ঞ বুড়ো নাবিকেরা এই দ্বীপগুলোর নাম দিয়েছিল শয়তানের দীপপুঞ্জ। দ্বীপগুলোকে ওরা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলত। এই অভিশপ্ত ত্রিভুজের ভিতরে আসলে কি ঘটছে তা বলতে পারছেনা কেউ। মাঝে মাঝে নিউটনের মধ্যকর্ষণ সূত্র বাতিল করে দেয় বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। কখনও কখনও এর চেয়ে বিস্ময় কর ঘটনা ঘটেছে। যেমন সবুজ রঙের উজ্জ্বল কুয়াশায় ঢাকা পড়ে ওখানকার সাগর। বিদ্‌ঘুটে জলস্তম্ভ উঠে যায় আকাশে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ সাগরের বুকে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড ঘুর্ণিপাক, হিংস্রভাবে জাহাজ গিলতে ছুটে আসে পাহাড় সমান ঢেউ।

সমুদ্রের ধার ঘেষে আমেরিকার এরোনটিস এর বিমান ক্ষেত্র অবস্থিত। ওভার ওয়াটার নেভিগেশনাল ফ্লাইট নামে একটা নিয়মিত মহড়া হয় এই বিমান ক্ষেত্রে। বৈমানিকদের সবাই ওরা দক্ষ পাইলট। তবুও বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেবার জন্যই প্রতিদিন দু-ঘণ্টা ধরে একশত মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে বারোটা বিমানের একটা স্কোয়াড্রন এই মহড়ায় অংশ গ্রহণ করত। আকাশে উঠে নিজ নিজ নির্ধারিত পথে উড়ে আবার বিমান ক্ষেত্রে ফিরে আসতো বিমানগুলো। সেদিন যথারীতি নির্ধারিত সময়ে আকাশে উঠলো বারোটা বিমান কিন্তু ফিরে এলো দশটা বিমান। বাকি দুটো আসছে না কেন ? এমন তো হয় না কখনও। অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না ওদেরকে পাওয়া গেল না ওদের কোন চিহ্ন।

ইদানিং পাশ্চাত্য বিশ্বে এ নিয়ে মহা হৈ চৈ হচ্ছে। বর্তমানে উদ্ভাবন করতে পারছে না এর রহস্য। ভবিষ্যতে সম্ভব হবে কি হবে না তাও কেউ বলতে পারে না। এই ট্রায়াঙ্গল এর ভিতরে অসংখ্য জাহাজ সাবমেরিন, বিমান ও মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও এক দুজন মানুষকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তারা কেউ মৃত অথবা এক দুই ঘণ্টা জীবিত থেকে মারা যায়। কোন কথা বলতে পারে নাই।

বহুরূপী জীবনকে দেখেছি

আবু হোসেন চৌধুরী
কলেজ নং ২২৮৭
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

জীবনকে দেখেছি আমি---
উড়ন্ত দুপুরের পড়ন্তবেলায় কৃষকের প্রত্যাবর্তনে কৃষাণীর হাসিতে।

জীবনকে দেখেছি আমি ---
রাজধানীর রাজপথে উলঙ্গ ছেলের বেঁচে থাকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

জীবনকে দেখেছি আমি---
সুস্নিগ্ধ শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় বস্তির মানুষের নগ্নদেহ আবৃত করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টাতে।

জীবনকে দেখেছি আমি---
সদ্য পাশ করা ছাত্রের চাকুরীর খোঁজে ঘুরে বেড়াবার জীর্ণ পাদুকা জোড়া আর পত্রিকার স্তূপে।

জীবনকে দেখেছি আমি---
জনগণের মিছিলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের হরতালে।

জীবনকে দেখেছি আমি---
শ্রমিকের ঘর্মাক্ত মুখ কিংবা গ্রন্থিল পেশীতে।

জীবনকে দেখেছি আমি।
কোন এক অসহায় বালিকার এসিড দগ্ধ মুখে।

জীবনকে দেখেছি আমি---
ডাস্টবিনের পাশে কুকুর ও ক্ষুধার্ত শিশুদের কোলাহলে।

জীবনকে দেখেছি আমি---
রুই কাতলাদের আইনের চাকাতে পিষ্ট অসহায় মানুষগুলোর ব্যর্থ অধিকারে।

জীবনকে দেখেছি আমি---
রাজনীতির নামে অরাজনৈতিক কার্যকলাপে

জীবনকে দেখেছি আমি---
জগন্নাথ হলের লাশের মিছিলে, বিদ্যাশ্রম থেকে যারা গেছে সোজা শ্মশানে।

জীবনকে দেখেছি আমি---
চিতার আগুনে ছাই হয়ে যাওয়া মায়ের স্নেহের ধন, বাবার গৌরবে।

জীবনকে দেখেছি আমি---
সাজানো সংসার থেকে উধাও হয়ে যাওয়া বেলোয়ারী সুখ আর মুছে যাওয়া অহংকারী টিপেতে।

জীবনকে দেখেছি আমি---
নিরব নিস্তব্ধতার চরাচরে বোবা অভিমানের অজস্র না বলা কথাতে।

একটি ঝরা ফুল

চৌধুরী ফয়জুর রব
কলেজ নং- ৪৩২২
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

॥ এক ॥

অপু ভাইয়া-অপু ভাইয়া, কানন ভাই এসেছে; মারুফ নাকি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

বকুলের আবেগ ভরা ডাক চিন্তাজাল ছিন্ন করে অপুর কানে প্রবেশ করল। গম্ভীর ভাবে মুখ তুলে বলল,

—কানন এসেছে বুঝি? ক্যাম্পের আর কোন খবর বলেছে?

—এইমাত্রইত এল, ওঘরে বসে আছে। তুমি যাও ভাইয়া, তোমার অপেক্ষায় বসে আছে।

দুইদিন হল ক্যাম্প থেকে রিলিজ পেয়ে বাড়ীতে ফিরেছে অপু। অবশ্য ক্যাম্প থেকে তাদের বাড়ী পায়ে হাঁটা পথ মাত্র। গত অপারেশনে মিলিটারীদের সাথে ওরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। পিছু হটেই শুধু তারা মুক্তি পায়নি শয়তানদের হাত থেকে। পালাতে গিয়ে অপুদের দল হারিয়েছে তাদের দলনেতা 'সাফেফকে, আহত হয়েছিল মারুফ গুরুতর ভাবে। আর অপুর পায়েও একটা বুলেট বিধেছিল, তবে এখন সে পুরোপুরি সুস্থ।

চিন্তা ছিল সব মারুফের জন্য। অপু যখন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারুফকে মৃত্যুর পাঞ্জার মুখোমুখি রেখে বাড়িতে ফিরছিল, তখন তার চোখের অশ্রু বাধ সাধেনি। আজ সেই মারুফের শুভ সংবাদে সত্যই সামান্য চিন্তামুক্ত হয়েছে অপু। যদিও মনেতার আর একটা বড় চিন্তা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল।

পাশের ঘরে ঢুকতেই কানন বলল,

—কিরে অপু, ভাল আছিস ত?

—মোটামুটি, তবে মা'র শরীর খুব একটা ভাল যাচ্ছে না।

—আজইত ক্যাম্পে ফিরছিস তুই, তাইনা?

—হুঁ সময় শেষ।

পাশের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বকুল তাদের কথোপকথন শুনছিল। অপুর যাওয়া সম্মতিটা তার বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানল। কিসের একটা অজানা আশংকায় ঘন কালো মেঘের ছায়া পড়ল বকুলের মুখমণ্ডলে।

—আর হ্যাঁ, শোন অপু কাল আমাদের অপারেশনে বেরুতে হবে। তুই দল প্রধান নির্বাচিত হয়েছিস।

—কিন্তু কি হবে এভাবে অনিশ্চিত অপারেশনে বেরিয়ে? যেখানে নিজেদের মানুষ নিজেদেরকে শত্রুর হাতে তুলে দেয়, উদ্ধার করে নেয় তাদের ব্যক্তি স্বার্থ, সেখানে আক্রমণ ব্যর্থ ছাড়া সার্থকতার কিছুই আমি দেখিনা।

—কিন্তু তবুও.....

—'কিসের তবুও'—কাননের কথা কেড়ে নিল অপু "আমি আগে দেখতে চাই কে বা কারা এই পাকিস্তানী সিপাহীদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খোঁজ করে দিচ্ছে আমাদের মুক্তি ঘাঁটির। যাদের জন্য আমরা দলনায়ক হারিয়েছি। পরাজয় আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়েছে মাথা পেতে।

॥ দুই ॥

রাত দশটা। ক্যাম্পে সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। তাদের পরবর্তী প্ল্যান রাজাকার দমন। বর্তমান ক্যাম্পচীফ আনোয়ার ভাইকে ঘিরে সবাই বসে।

—'আনোয়ার ভাই, গতদিন যে দুই শালা মিলিটারীদের সাথে ছিল তার একটিকে আমি চিনেছি, তার রক্ত না দেখা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।' অনেকটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল অপু।

—'কিন্তু কে সে',—চিন্তা আবৃত মনে প্রশ্ন রাখলেন আনোয়ার ভাই।

—সে হচ্ছে সোহেল, এবং তার সমস্ত দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়েদিন, আনোয়ার ভাই।

—বলিস কি অপু! সো-হে-ল!

অন্তরে খুব আঘাত পেল কানন। অপুদের পরিবারের সাথে সে বহুদিন ধরে পরিচিত। অপুর ছোটবোন বকুলকে সে আপন বোনের মতই মনে করে। বকুল ভাল বাসে সোহেলকে, সোহেলের মৃত্যু কোন ক্রমেই সইতে পারবেনা বকুল। সার্থের মোহে সোহেল আজ অন্ধ। তার এই অন্ধত্ব একটি নিষ্পাপ মনের বজ্রঘাত স্বরূপ দাড়াবে কারণ, একবার ধরা পড়লে সোহেলের ভাগ্যে জুটবে নির্মম মৃত্যু।

॥ তিন ॥

পরদিন সকাল। মেঘ ঢাকা আকাশে প্রভাতের সূর্য অনেকটা মলীন। সবাই ক্যাম্পের বাইরে বসে। এই মাত্র নাস্তারপর্ব শেষ হয়েছে।

রাত বারটায় অপু, কানন এবং সঙ্গে আরো দু'জন যুবক একসাথে বেরিয়েছিল। এখনও ফেরেনি তারা।

—'শোন সকলে'—সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আনোয়ার ভাই।—'আজ রাত বারটায় উত্তরের ঘাটিতে আঘাত হানব আমরা। অন্যদুটি মুক্তি ফ্রন্টও একই সাথে নিজ নিজ অবস্থানের দিকে আক্রমণ চালাবে।'

সকলের মধ্যেই প্রস্তুতির একটা রব পড়ে গেল। যে যার বন্দুকের নালী সাফ করছিল এতক্ষণ, হঠাৎ কাননের তীব্র ভাষায় চিৎকার সকলের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল পাশের জঙ্গলাকীর্ণ সরু পথের দিকে।

—আয় শালা, কুত্তা কোথাকার। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশেরই বিরুদ্ধে চক্রান্তের মজা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

হাত বাধা অবস্থায় সোহেলকে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন মুক্তি। সামনে অপু পিছনে পিছনে এগিয়ে আসছে কানন। দুজনের মুখেই মেঘঢাকা চাঁদের মত আবছা গাম্ভীর্যের ছাপ।

খুঁটির সাথে শক্ত করে বাঁধার ব্যবস্থা করা হল সোহেলের জন্য।

সোহেলর খবর এতক্ষণে অপুদের বাড়ীতে পৌছেঁ গেছে, এমনকি বকুলের কানে পৌঁছতে ও দেরী হয়নি।

পাশের তাঁবুর আড়ালে অপু, আনোয়ার ভাই ও কাননের কথোপকথন চলছিল।

—আচ্ছা আনোয়ার ভাই সোহেলকে কি একেবারে প্রাণে না মারলে চলে না, আপনি হয়ত জানেন যে, সোহেল আমাদের বন্ধু এবং অপুর বোন বকুল সোহেলকে ভালবাসে।

—'ছিঃ ছিঃ এই বুঝি তোমাদের মুক্তি প্রবণ প্রাণ, এই বুঝি তোমাদের আদর্শ'—ধিক্কারের সুরে বলে উঠল বকুল।

পিছন থেকে কখন যে সে এখানে এসে পৌঁছেছে তা সবার অজানা।

—বকুল তুই এখানে!

—হ্যাঁ অপু ভাইয়া আমি এসেছি আমার জীবনের পরীক্ষা দিতে।

—বকুল !

—হ্যাঁ আজ আমি নিজ হাতে সোহেলের শাস্তি দিব।

—'এ হয় না বকুল'—বলল কানন—হয়ত সে সংশোধন হতেও পারে।

—না সে আমার ভালবাসায় আঘাত হেনেছে, আঘাত হেনেছে মাতৃভূমির ভালবাসায়।

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে অপুর হাল্কা করে ধরা হাতের বন্দুকটা নিজ হাতে তুলে নিল বকুল। উন্মাদিনীর মত ছুটে পৌঁছে গেল পিছমোড় করে বাঁধা সোহেলের সামনে। নির্বিকার সোহেল, অপরাধী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে বকুলের দিকে। যেন সে বলতে চায়—

'বকুল, তুমি আমাকে হত্যা কর। যে পাপ আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

বকুল আমাকে যদি ভাল বেসে থাকো তবে হত্যা কর আমাকে।'

আজ সোহেল অনুতপ্ত। ক্ষমা চাওয়ার মত মানসিকথতা তার নেই। অনুতপ্ত মনে একবার শুধু উচচারণ করল—'বকুল'।

সাথে সাথে বকুলের হাতের বুলেট তার বুকটা ভেদ করল। চিরনিস্তেজ হয়ে গেল সোহেলের শরীর।

পর মুহূর্তে আরেকটি গুলির আওয়াজ। দৌড়ে এল সবাই। এতক্ষণে নদীর জল বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে। নিভে গেছে দুটি জ্বলন্ত প্রদীপ।

রক্তে রেঙে উঠেছে বকুলের নীলপেড়ে সাদা শাড়ির খানিকটা অংশ। অপুর কোলে তার মাথা। জীবনের শেষ সীমানায় পৌঁচেছে সে, তবুও যেন মনে হচ্ছে আজ তার কোন ব্যথা নেই, নেই কোন মানসিক যাতনা—ঠোঁটের কোণে এখনও একটুকরো শুভ্র হাসি অস্তমিত সূর্যের মত উজ্জ্বল।

জড়ানো মুখে হাসি টেনে বলল বকুল,

– ভাইয়া, কখনও অত্যাচারীদের ক্ষমা করোনা, দেশের জন্য যুদ্ধ করে যাও, দেশকে মুক্ত কর শত্রুর হাত থেকে। অত্যাচারীদের ক্ষমা করোনা ভাইয়া, অত্যাচারী .....দের..... ক্ষমা....মা....করো....র....না।

চিরদিনের মত ঝরে গেল বকুল। ঠোঁটের এককোণে তার শুভ্র হাসি এখনও বিদ্যমান। অপুর চোখের দু'ফোটা অশ্রু বকুলের নয়ন মুদে যাওয়া মুখমণ্ডলের উপড় পড়ল—এ যেন ভোরের শিশির-সিক্ত শুভ্র বকুল ফল।

সময়

চৌধুরী ফয়জুর রব
কলেজ নং ৪৩২২
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)

পথচারী যায় পথ পেরিয়ে
দিনগুলো যায় যে গড়িয়ে,
চলমান কালগুলো বয়ে যায় অতীতে
নেই কোন বিশ্রাম অবিরাম গতিতে।
ঘড়িটার টিক টিক অবিরাম চলছে
চলমান ধরণীটা অবিরাম ঘুরছে।
আমরা মানুষ সব ক্ষণকাল স্থায়ী
লাগালে সময় কাজে হবো মোরা জয়ী,
সময় লাগালে কাজে সুখ আছে পাছে,
যেমনি, সেবিলে গাছ পাকা ফল গাছে।

মিলাদ শরীফ ঃ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

লোকমান আহমদ আমীমী
মৌলভী (ধর্ম শিক্ষা বিভাগ)

মীলাদ অর্থ জন্ম গ্রহণ করা বা জন্ম বৃত্তান্ত। মিলাদ শরীফে বলতে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা বুঝায়। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআন সর্ব শেষ কিতাব। তাঁরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন রাসূলের আবির্ভাব হবে না, কাজেই আর কোন আসমানী কিতাবও নাযিল হবে না। সে জন্য কুরআন মজীদে হাদীস শরীফে জীবনী গ্রন্থ সমূহে তাঁর জীবন কাহিনী সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। যাতে তাঁর নিখুঁত ও সুন্দর জীবন মানব সমাজ অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারে। তাই আল্লাহতালা বলেছেন: "(হে রাসূল) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা সত্যিকার ভাবে আল্লাহকে ভালবাস, তবে তোমরা আমারই অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের পাপ মোচন করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" নবী (দঃ) কে অনুসরণ করার প্রয়োজনে তাঁর বিস্তারিত জীবনী আমাদের জানা দরকার। সুতরাং মিলাদ শরীফ রাসুল পরিচিতির পথ নির্দেশ করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর জীবনী কাল তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ নূরানী জীবন। যে জীবন কাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন: 'আল্লাহ তা'লা সর্ব প্রথমে আমার নূরকে পয়দা করেছেন। সে নূরেই আল্লাহ্ পাক সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।' সৃষ্টির সূচনা কিভাবে কিসের মাধ্যমে হয়েছে এ বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর এ হাদীসে আমরা পাই। লক্ষ লক্ষ বছর পর্যন্ত তিনি নূরের আকারে আরশে পাকের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। পরবর্তী কালে হযরত আদম (আঃ) এর ললাটে সে নূর সুশোভিত ছিল বংশ পরম্পরায় অবশেষে তাঁর পিতা আবদুল্লাহর মাধ্যমে সে নূর মা আমেনার গর্ভে মাহে রজবের প্রথম জুমার রাতে স্থান লাভ করে। পরবর্তী কালে সে পবিত্র নূরের প্রভাব তাঁর শরীরের উপর বিশেষভাবে প্রতিফলিত ছিল। সে জন্য কথিত আছে যে, তাঁর শরীরের কোন ছায়া ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর শারীরিক জীবন। ৫৭০ বা ৫৭১ ঈসায়ী সালে রবিউল আউয়াল মাসের ৮, ৯, বা ১২ তারিখ সোমবার উষালগ্নে তাঁর শুভজন্ম নবুয়তের পূর্ববর্তী ৪০ বছর ও নবুয়ত রিসালাত প্রাপ্তির পরবর্তী ২৩ বছর মোট জীবন কাল ৬৩ বছর। (মতান্তরে মিরাজ শরীফে তাঁর জীবনের অতিরিক্ত ২৭ বছর ব্যয় হয়। সে হিসেবে তাঁর জীবন কাল দাঁড়াল ৯০ বছরে)।

তৃতীয়তঃ অধ্যাত্মিক জীবন। তাঁর তিরধানের পর হতে বেহেশতের মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থান লাভ করা পর্যন্ত এ জীবন কাল সৃষ্টির প্রথম বিন্দু হতে শেষ বিন্দু পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থায় তিনি বিকশিত। উপরোক্ত ত্রিবিধ জীব কালের যে কোন অধ্যয় নিয়ে আলোচনা করা হক না তা' মিলাদ শরীফের অংশ বিশেষ।

মিলাদ শরীফে মহানবী (দঃ) এর জীবনী আলোচনা করা হয়। তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা হয়। আল্লাহ তালা'র বাণী : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা ও তাঁর ফিরিশতারা নবী (দঃ) প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন। হে মুমিনরা তোমরাও তাঁর প্রতি যথাবিহিত দরূদ ও সালাম পেশ কর।' অর্থাৎ হুযুর (দঃ) কে অনুসরণ করে ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে দরূদ ও সালাম পাঠ কর। আল্লাহ্ তা'লার দরূদ ও সালাম পাঠের অর্থ— আল্লাহ্ তা'লা রাসূলে (দঃ) প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করেন। ফিরিশতাদের দরূদ ও সালাম পাঠের অর্থ তাঁরা হুযুর (দঃ) প্রতি রহমত ও শান্তি নাযিলের জন্য আল্লাহ তা'লার দরবারে দোয়া করেন।

কাজেই মুমিন মুসলমান হিসেবে মহানবী (দঃ) এর প্রতি দরূদ ও সালাম তথা আশীষবাণী পেশ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

হুযুর (দঃ) এর পবিত্র নাম শুনলে বা উচ্চারণ করলে প্রথমবারে দরূদ ও সালাম পাঠ করা ওয়াজিব এবং পরবর্তী বারগুলোতে মুস্তাহাব। নামাযের বৈঠকে আত্তাহিয়াতুর মাধ্যমে দরূদ ও ও সালাম পাঠ করা ওয়াজিব। নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। মহানবী (দঃ) এর রওযা শরীফে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ মসজিদে প্রবেশের সময় ও বের হওয়ার সময় মুনাজাতের আগে ও পরে দরূদ ও সালাম পেশ করতে হয়। এ ছাড়া অনেক স্থান ও সময়ে দরূদ ও সালাম পেশ করার বিধান রয়েছে।

দরূদ ও সালাম পাঠ সম্পর্কীয় আয়াত খানা (ইন্নাল্লাহা ও মালইকাতাহু) অবতীর্ণ হলে, সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সমীপে আরয করেছিলেন : 'আপনার অবর্তমানে আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করলে তা আপনার খিদমতে পৌছবে কিনা ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (দঃ) বললেন—নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা আম্বিয়া কিরামের শরীর বিনষ্ট করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।' (তিরমিযী শরীফ) প্রকৃত পক্ষে এ বাণীর মাধ্যমে নবী রাসূলের ইনতেকালের পর তাঁদের শরীর অবিকৃত অবস্থায় আলমে বরযখে বিদ্যমান থাকার কথা তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং আন্তরিকতার সহিত রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করলে তা' তাঁর খিদমতে পৌঁছে যায় বা ফিরিশতার মাধ্যমে পৌঁছান হয়।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অনুসরণকারীদের প্রসংগে বলেছেন : 'যারা আল্লাহর যিকর করে দাঁড়িয়ে বসে এবং পার্শ্বদেশে শয়ন করে।' আল্লাহতা'লার যিকর উপরোক্ত তিন অবস্থায় করা যায়। তদ্রূপ দরূদ ও সালাম দাঁড়িয়ে ও বসে পাঠ করা যায়। কেননা দরূদ ও সালাম যিকর ও ইবাদত বৈ কিছু নয়। দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করা কুরআন ও হাদীসে নিষেধ করা হয়নি। কাজেই দাঁড়ান জায়েজ। কোন কিছু নাজায়েয হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট নয় যে, এর প্রমাণ কুরআন বা হাদীসে নেই। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন : 'আল্লাহ তালা' যা' তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন, তা' হালাল। আর যা 'আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কিতাবে হারাম বলেছেন তা' হারাম আর যে বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন করেছেন, তা' মাফ অর্থাৎ করা বা না করা সমান কথা। একে মুবাহ বলা হয়। মুবাহ কাজমুবাহ কাজ সওয়াবের নিয়তে করলে সওয়াব পাওয়া যায়।

দরূদ ও সালাম পাঠ করার সময় হাত বেঁধে আদব রক্ষা করতে হয়। দোয়া-দরূদ ও কিরায়াত পাঠের সময় হাত বাঁধা মুস্তাহাব। মাহফিলে মিলাদ শরীফে আতর সুগন্ধি ব্যবহার করা, গোলাপ পানি ছিটান এবং মিষ্টান্ন বিতরণ রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর পসন্দনীয় জিনিসের অনুশীলন বৈ কিছু নয়। পবিত্রতা ঈমানের অংগ' রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর বাণীকে মিলাদ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুন্দর পরিবেশ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হয়। মিলাদ অনুষ্ঠান শেষে দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের কাঙ্ক্ষিত মুনাজাত করি। রাসূলে পাকের খাতিরে আল্লাহ তা'লা আমাদের দোয়া করেন। মহানবীর ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সমাজিক জীবন অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে আমাদের মিলাদ মাহফিলগুলো সার্থক হল তাই কামনা করি।

আর রক্ত নয়

সুলতান উদ্দিন আহ্‌মেদ
প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ

রক্ত জীবদেহের তথা মানবদেহের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রক্তের অনেকগুলো কাজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রতিটি জীবকোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়া এবং কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড দেহ থেকে বিদূরিত করা। মানুষ বা অন্যপ্রাণী শ্বাস নেওয়ার সময় যে বায়ু গ্রহণ করে তা মানুষ বা প্রাণীর ফুসফুসে চলে যায়। সেখানে থেকে বায়ুর (যার মধ্যে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য উপাদান থাকে) শুধুমাত্র অক্সিজেন ধরে নিয়ে জীবকোষে পৌঁছে দেয়। রক্ত আবার হৃৎপিণ্ড হ'য়ে ফুসফুসে ফিরে আসার সময় কোষ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করে নিয়ে আসে। পরে ওটা আমাদের নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসে। এই নিয়মের ব্যত্যয় হ'লে আর রক্ষা নেই। অকালে অক্কা পেতে হয়।

আর এ মহৎ কাজটিই করছে আমাদের দেহের (জীবদেহের) লোহিত রক্তকণিকার একটি উপাদান, যার নাম, "হিমোগ্লোবিন।" হিমোগ্লোবিনের প্রধান উপাদান হ'চ্ছে লৌহ নামক মৌলিক পদার্থটি। এই লৌহ-ই অক্সিজেন বহন করে কোষে পৌঁছে দেয় এবং কোষ থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে ফুসফুসে এনে ছেড়ে দেয় যা নিঃশ্বাসের সাথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

এই লৌহ ও আরো কতিপয় মৌল রয়েছে যাদেরকে রসায়নবিদগণ অবস্থান্তর মৌল বলেন। অবস্থান্তর মৌল বলতে সব মৌলকে বুঝায় যাদের শক্তি স্তরে ইলেকট্রোন বিতরণের সময় দেখা যায়---যে ভেতরের শক্তি স্তর অপূর্ণ রেখে ইলেকট্রোন বাইরের শক্তিস্তরে চলে যায়। যেমন লৌহ পরমাণুর সর্বমোট ২৬টি ইলেকট্রোন বিতরণ ($1s^2 2s^2 2P^6 3s^2 3P^6 3d^6 4s^2$) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ভেতরের অর্থাৎ ৩ নং শক্তি স্তরের d-- অর্বিটাল অপূর্ণ রেখে (যার ইলেকট্রোন ধারণ ক্ষমতা সর্বাধিক ১০টি) বাইরের ৪নং শক্তিস্তরে ইলেকট্রোন চলে গেছে। এমনি একটি মৌল হ'চ্ছে কোবাল্ট (Co)। অবস্থান্তর মৌলগুলো সাধারণতঃ জটিল যৌগ তৈরী করে। যেমন হিমোগ্লোবিন লৌহের একটি জটিল যৌগ। এর গঠন নিম্নরূপ—

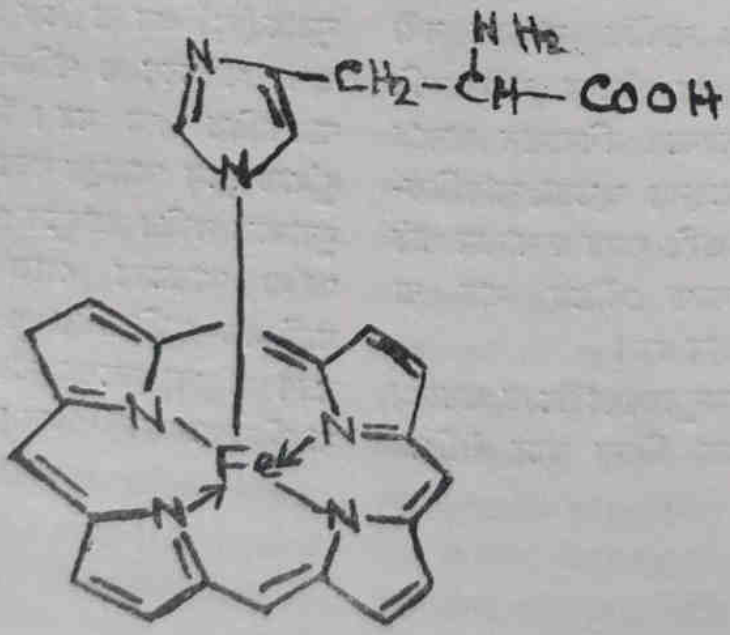

ঐরূপ কোবাল্ট ২ অনু অ্যাসিটাইল অ্যাসিটোন ও ২ অনুপানির সাথে একটি জটিল যৌগ তৈরী করে। [যার সংকেত $Co(acac)_2(H_2O)_2$]।

উৎপন্ন যৌগ ট্রাইফিনাইল ফসফিনের সাথে যুক্ত হয়ে নিম্নরূপ যৌগ (a) তৈরী-করে —

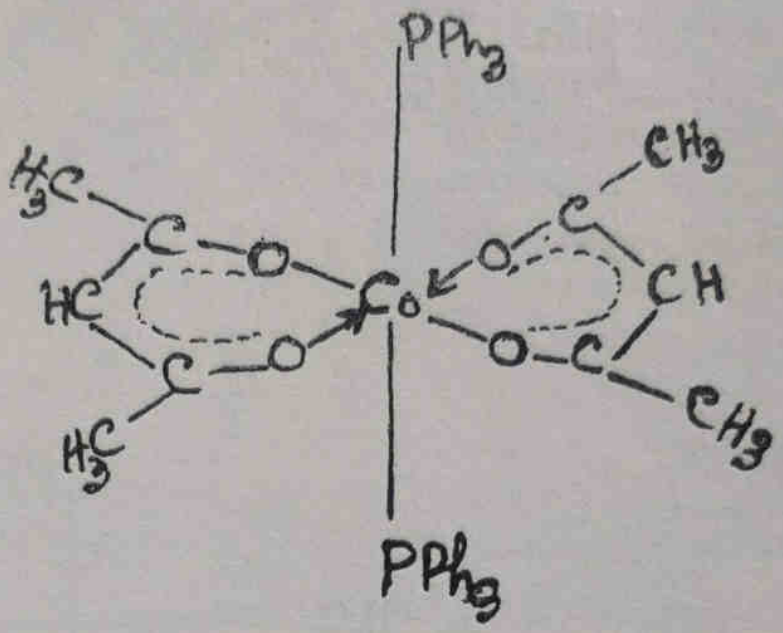

(a)

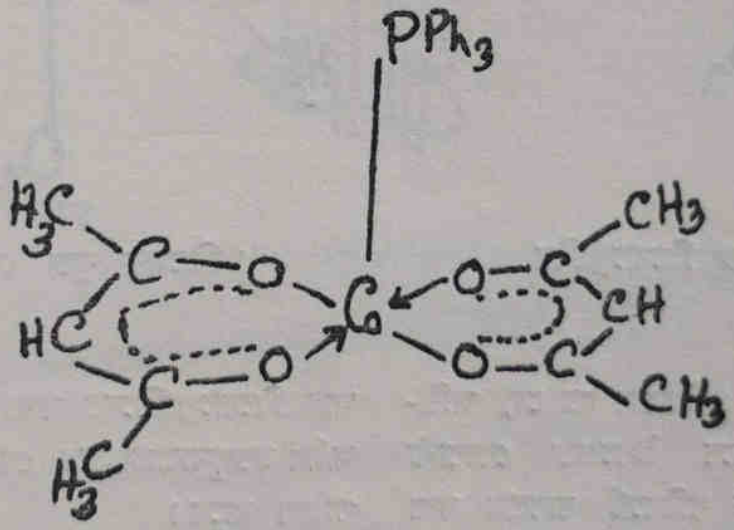

(b)

অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হওয়ার পূর্বাবস্থা

এই ট্রাইফিনাইল ফসফিনযুক্ত যৌগ বায়ুমণ্ডল থেকে ২৫°C—৩২°C তাপমাত্রায় আণবিক অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়। এবং কিছুটা কম চাপে আবার অক্সিজেন ত্যাগ করে। উপরোক্ত তাপমাত্রা মানবদেহের তাপমাত্রার অতি নিকটবর্তী যে তাপমাত্রায় হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন গ্রহণ

করে এবং কোষে ছেড়ে দেয়। হিমোগ্লোবিন ও কোবাল্ট যৌগের অক্সিজেন ধারণ নিম্নরূপে প্রদর্শন করা যায় —

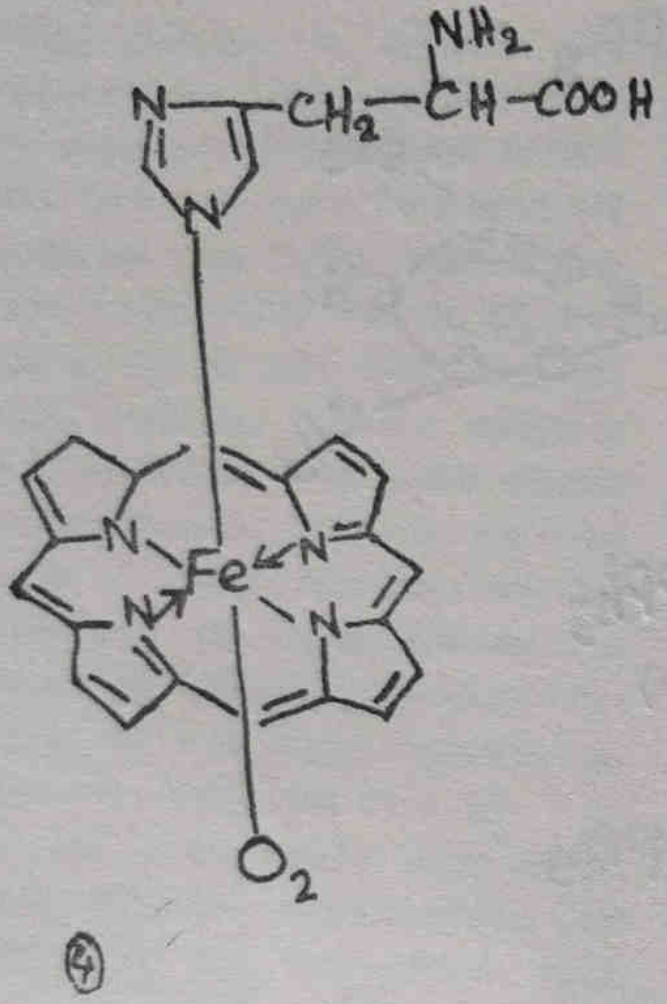

(৭)

অক্সিজেন যুক্ত হিমোগ্লোবিন

কোবাল্ট যৌগ অক্সিজেন ধারণ করে এবং প্রয়োজনীয় পরিবেশে তা ছেড়ে দেয় এবং পরক্ষণে কার্বনডাইঅক্সাইড অপসারণ করে, তবে

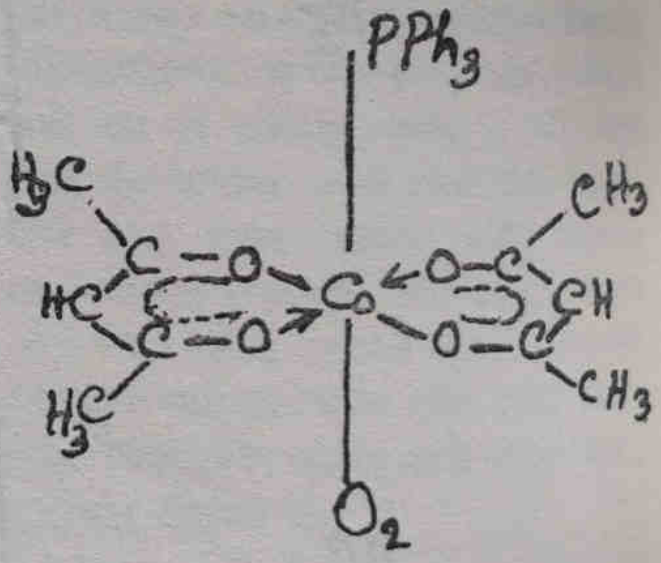

অক্সিজেন যুক্ত কোবাল্ট যৌগ

অতএব, এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অক্সিজেনের বাহক হিসেবে উপরোক্ত কোবাল্ট যৌগ হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হ'চ্ছে কোবাল্ট যৌগ হিমোগ্লোবিনের লৌহের ন্যায় কার্বনডাইঅক্সাইড গ্রহণ ও ত্যাগ করে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, আর হিমোগ্লোবিনের কথা ভাবতে হবে না। অর্থাৎ রক্তশূন্যতার হাত থেকে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে গবেষকরা প্রমাণ করবেন যে, রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিবর্তে কোবাল্টের উপরোক্ত জটিল যৌগ ব্যবহার সম্ভব।

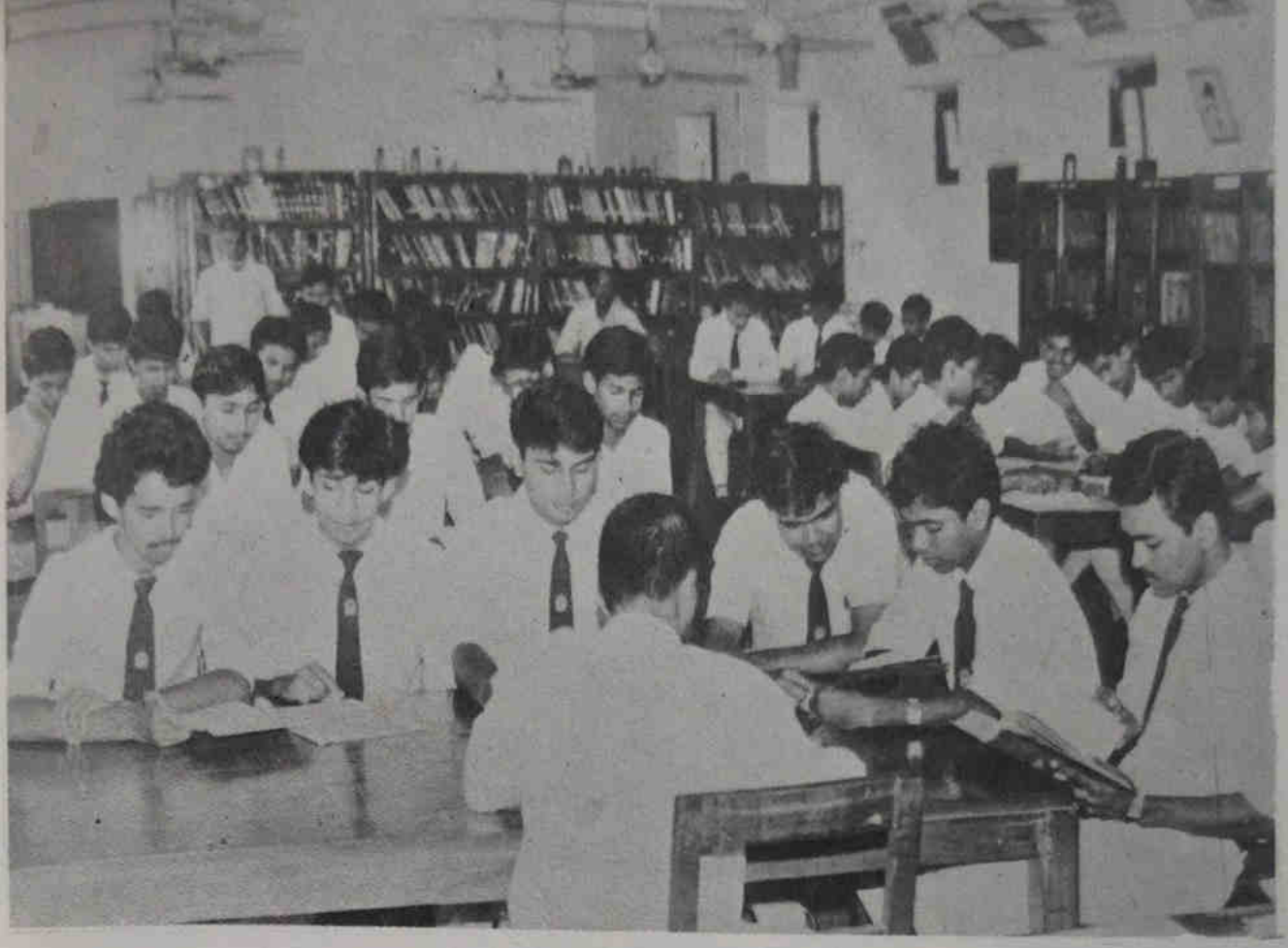

গ্রন্থাগার

টেক্‌স্টবুক ও স্টেশনারী স্টোর

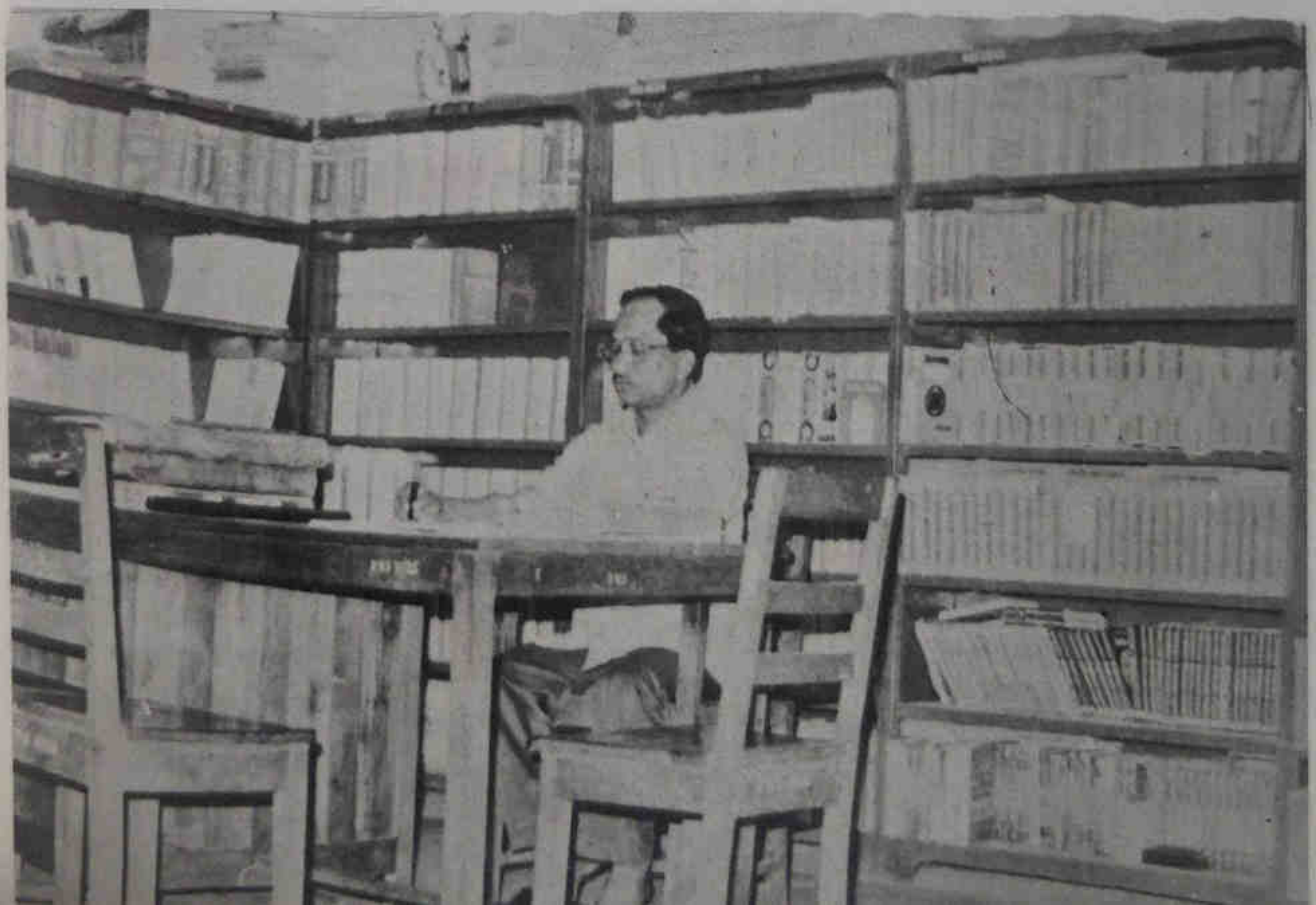

পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগার

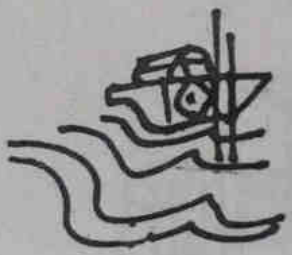

রসায়ন বিজ্ঞান গবেষণাগার

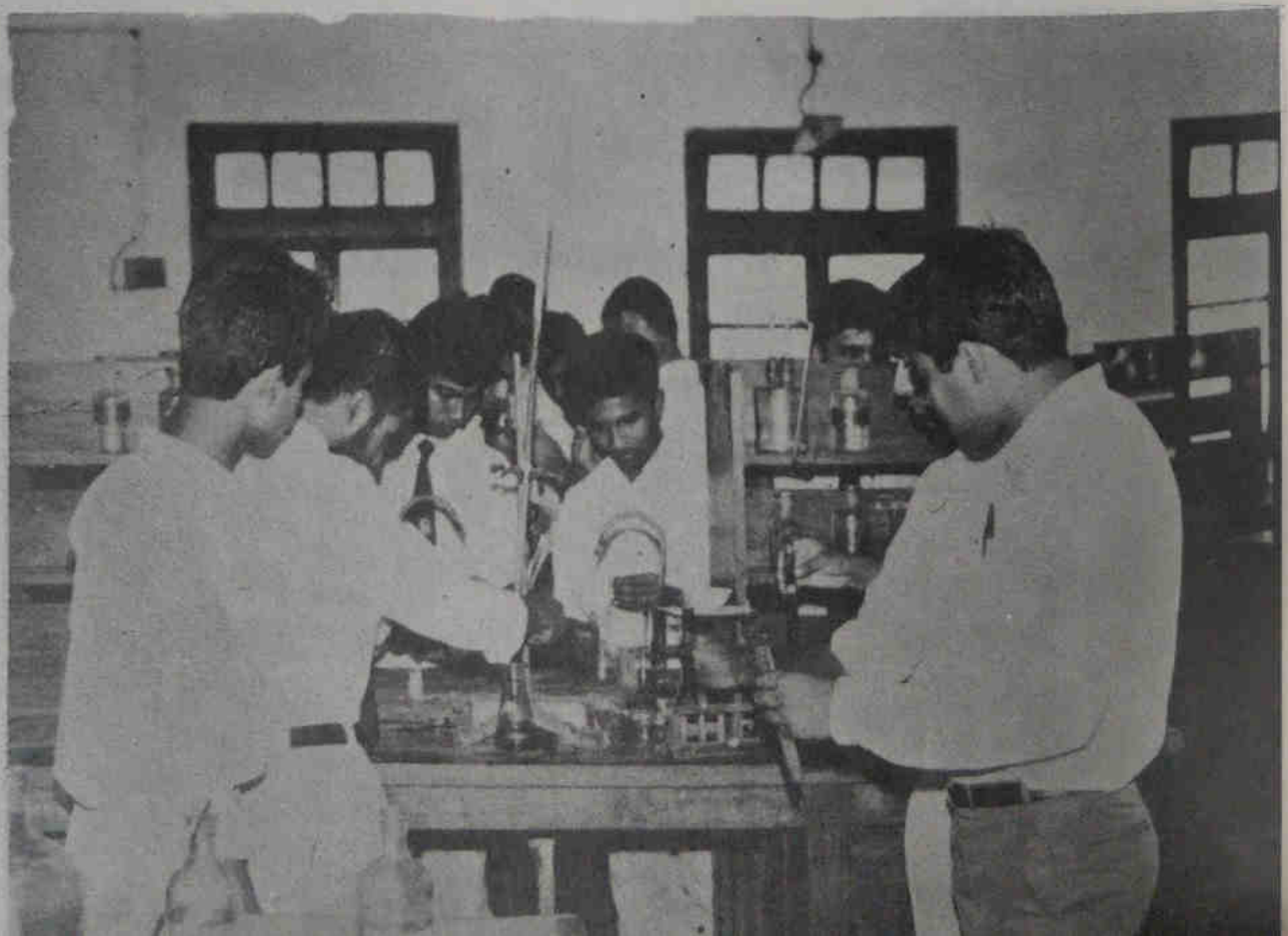

জীববিজ্ঞান গবেষণাগার

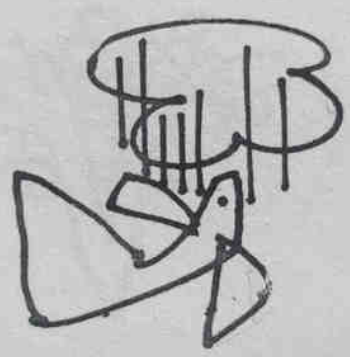

ভূগোল গবেষণাগার

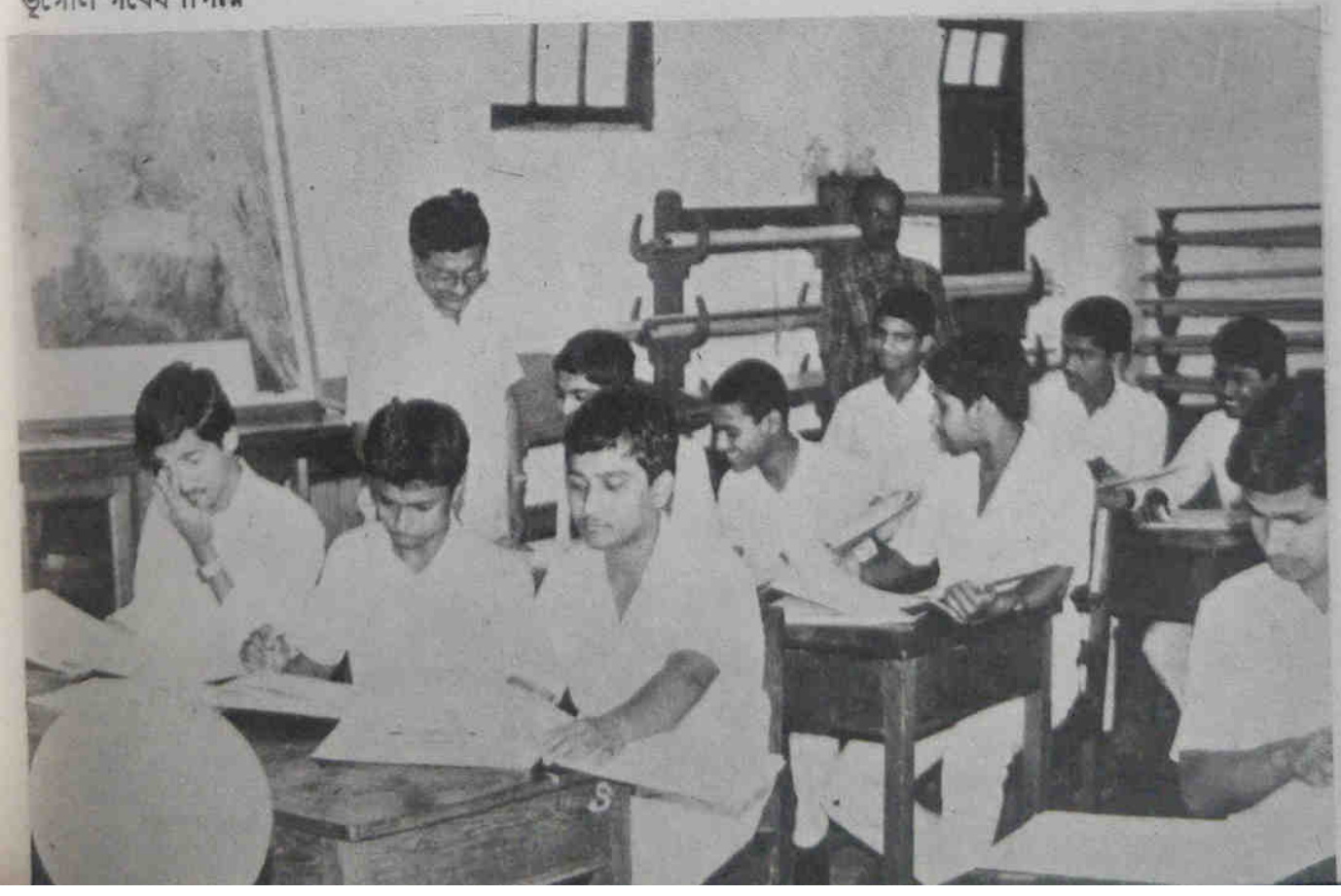

চিকিৎসা কেন্দ্র

কলেজ ক্রিকেট টীম

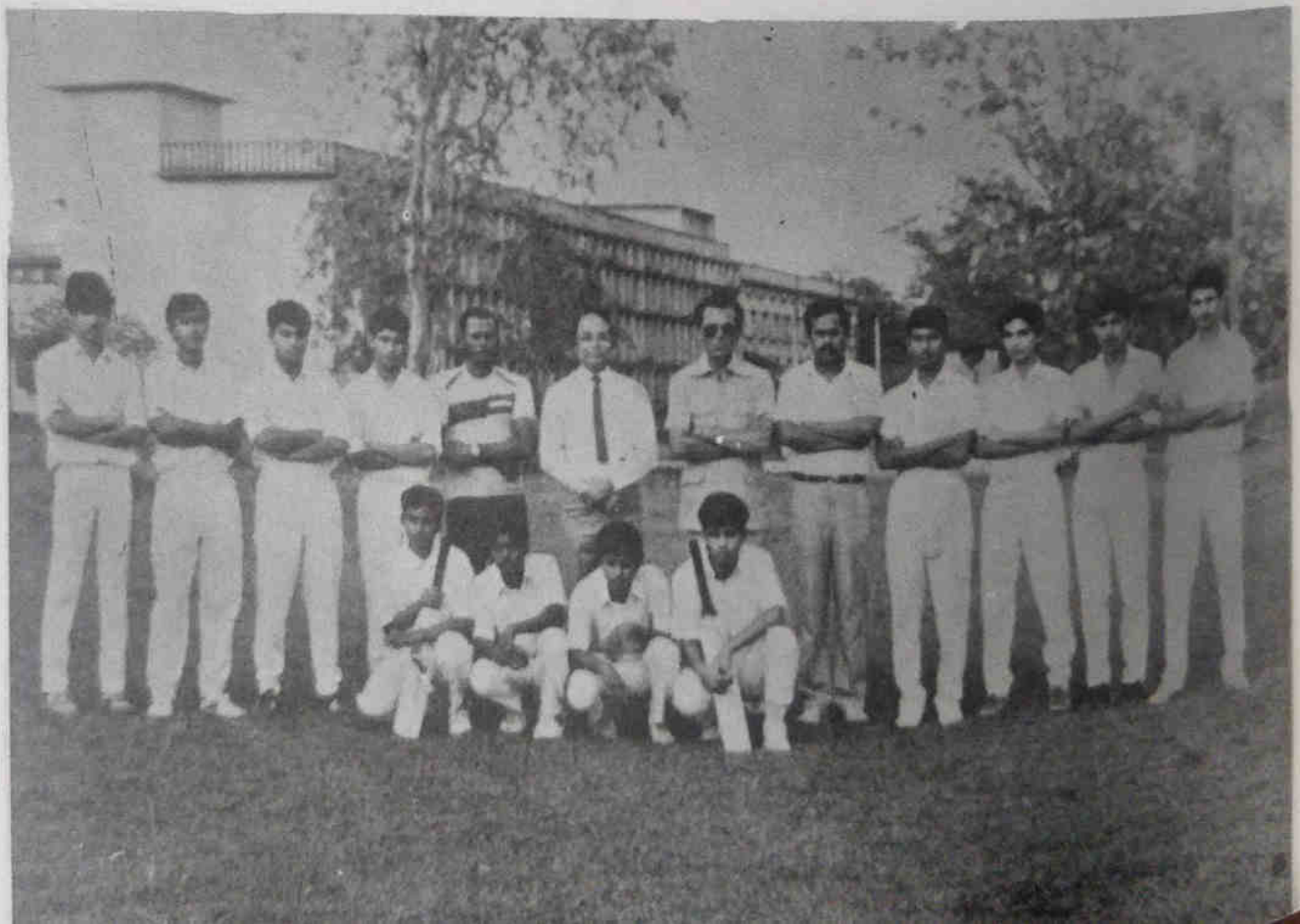

কলেজ ফুটবল টীম

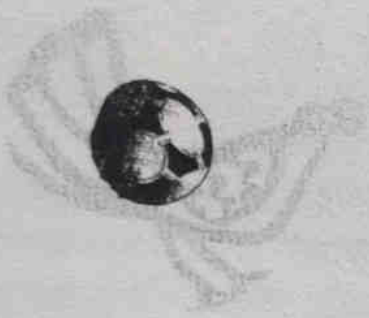

কলেজ হকি টীম

কলেজ ভলিবল টীম

কলেজ বাস্কেট বল টীম

মানব জীবন ও যুক্তিবিদ্যা

মোঃ খোরশেদ আলম
কলেজ নং ৪১০৭
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তারা স্বভাবগত-ভাবেই চিন্তাশীল প্রাণী। মানুষের স্বীকৃত সংজ্ঞায় বলা হয় 'মানুষ যুক্তিবাদী জীব', 'Man is a rational animal'। মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সঠিকভাবে জীবন যাপন করার জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক যুক্তির। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, মানুষের চিন্তার রীতিনীতি নিয়ে যে বিজ্ঞান তৈরী হয় তারই নাম যুক্তিবিদ্যা। বলাবাহুল্য যুক্তিবিদ্যার ইংরেজী শব্দ হচ্ছে logic আর এ logic শব্দের উৎপত্তি গ্রীক ভাষার logos শব্দ হতে। শব্দের গ্রীক বিশেষণ loggike এবং সেখানে হতেই ইংরেজীতে logic শব্দটি এসেছে। logic শব্দের অর্থ হচ্ছে 'চিন্তা' বা 'শব্দ'।

যুক্তিবিদ্যা বলতে আমরা মূলতঃ পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যাকে বুঝি। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলকে লজিকের 'আদিপিতা' বলা হয়। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করা ঠিক নয় যে, এরিস্টটল জন্ম গ্রহণ করা মাত্রই মানুষকে যুক্তি শিক্ষা দিয়েছিলেন কিংবা তাঁর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ অযৌক্তিক ছিল। যদিও মানুষ আবহমানকাল থেকেই যুক্তিতর্ক করতে পারতো, তথাপি বর্তমান যুগের শিক্ষিত মানুষ সঠিক যুক্তি প্রদান এবং ভ্রান্তি নির্ধারণ পারদর্শিতার সাথে করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান মানুষের এ সঠিক চিন্তা ও যুক্তির ক্ষেত্রে এরিস্টটলের গবেষণা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার অবদান অবিসংবাদিত। মানুষ যুক্তিবাদী জীব থাকা সত্ত্বেও এরিস্টটল যখন যুক্তির নিয়মনীতিকে সুসংবদ্ধভাবে লিখিত রূপ দিলেন, আপাততঃ শুদ্ধ কিন্তু ভ্রান্ত যুক্তি কত প্রকার ইত্যাদি বিষয় সুচিন্তিতভাবে লিপিবদ্ধ করে দিলেন, তখন এরিস্টটলের এ প্রচেষ্টা দ্বারা পরবর্তী মানবকুল জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা অবশ্যই বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে।

মোটকথা যুক্তিবিদ্যা 'চিন্তাহীন ও যুক্তিশূন্য' মানুষের মধ্যে চিন্তা ও যুক্তিকে সৃষ্টি করে না। যুক্তিবিদ্যা যুক্তিবাদী মানুষের যুক্তির ক্ষমতা ও পদ্ধতি সমূহকেই বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা উন্নত ও সঠিক করার চেষ্টা করে মাত্র। সেনাবিভাগে যেমন মানুষকে হাঁটতে শিক্ষা দেয়া হয় না, কিন্তু তাঁর হাঁটার উন্নতি সাধন করা হয় অর্থাৎ এক সাথে পা মিলিয়ে চলার কিংবা 'মার্চ' করার কৌশল শিক্ষা দেয়া হয়। 'লজিক' তেমনি মানুষকে চিন্তা করতে শিখায় না ; তার সহজাত চিন্তা শক্তিকে সঠিক ও উন্নত করার বিধান সমূহ প্রতিষ্ঠা করে সত্যে উপনীত হবার জন্য সঠিক চিন্তা এবং যুক্তির নির্দেশ দান করে।

একথা সবারই বোধগম্য যে যুক্তিবিদ্যার অধ্যয়নে ব্যক্তিমাত্র ভ্রান্তিশূন্য হয়ে যায় না, বরং ভ্রান্তিকে উপলব্ধি করে উহা ত্যাগ করা শিক্ষা দেয়। কেননা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান না পরেও মানুষ স্বাস্থ্যবান হতে পারে। সুতরাং লজিক অধ্যয়নে যুক্তির বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি বিশ্লেষণ করে, কোন প্রকারের যুক্তির নিয়ম লঙ্ঘনে কিরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তা পরিহার করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

মানুষ স্বভাবতঃই উন্নত জীবন যাপন করতে চায়। আর এ উন্নত জীবনের জন্য সঠিক যুক্তি অপরিহার্য। স্বাভাবিকভাবে সকলের জ্ঞাতার্থের জন্য যুক্তিবিদ্যার এ অপরিহার্যতা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করছি।

প্রথমত, যুক্তিবিদ্যা সঠিক যুক্তির নিয়ম-নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে। এ নিয়ম-নীতির অনুস্মরণে সঠিক যুক্তির গঠন ও প্রয়োগ এবং তার মারফত সত্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত, যুক্তিবিদ্যা সমস্ত বিজ্ঞানের মৌলিক নিয়মাবলীকে লঙ্ঘন করে, কোন বিজ্ঞানই যুক্তি

সঙ্গত ও সঠিক হতে পারে না। এ বিচারে যুক্তি বিজ্ঞানের অধ্যয়ন অপরাপর বিজ্ঞানের অধ্যয়ন এবং অনুধাবনে আমাদের সাহায্য করে।

তৃতীয়ত, যুক্তিবিদ্যা মানুষের বিশ্লিষ্ট চিন্তার বৃদ্ধি ও তীক্ষ্ণ করে। যুক্তিবিদ্যার আলোচিত বিষয়-সমূহ মানুষের চিন্তার বিভিন্ন দিককে তীক্ষ্ণ এবং উন্নত করে তোলে; যুক্তিবাদী মানুষকে চিন্তা এবং চিন্তার প্রকাশের ক্ষেত্রে অধিকতর সঠিক হতে সাহায্য করে। যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে যুক্তিচর্চা। কোন কিছুর চর্চা যেমন পূর্ণতর করে, তেমনি যুক্তির চর্চাও মানুষের যুক্তিকে সঠিকতর করে তোলে।

মানুষ আদিম কাল হতে অনেক উন্নতি সাধন করেছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন যুক্তিবিদদের অবদান মানুষের কাছে অম্লান হয়ে বেঁচে থাকবে। যুক্তি-বিদ্যা মানুষকে করে তুলেছে মহৎ এবং বলিষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী। যুক্তিবিদ্যা পাঠের মাধ্যমে মানুষের জীবন সফল হোক, সুন্দর হোক এবং আবিষ্কার করুক নব নব বস্তুর। এজন্য সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম।

মাতৃভূমি

মোঃ মাইনুল কবির
কলেজ নং ৪২৬৯
একাদশ শ্রেণী (মানবিক)

বাংলা আমার মাতৃভূমি সকল দেশের সেরা
বাংলা আমার জন্মভূমি প্রাণ উদাস করা,
সাত সকালে উঠেই শুনি পাখির ডাকাডাকি
রোদ-দুপুরে নদীর পানি করে ঝিকিমিকি।
মাতৃভূমি বাংলা আমার মৌরি ফুলের রেণু,
ক্লান্তদেহে রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশের বেণু।
মাতৃভূমির গৌরবে মোরা আনন্দে গান গাই,
মাতৃভূমির অগৌরবে প্রাণে ব্যথা পাই।
মাতৃভূমি তোমায় দিলাম সঁপে মন প্রাণ,
জীবন দিয়ে রাখতে যেন পারি দেশের মান
চল্ ভাই আজ শপথ করি দেশকে মোরা তুলবো গড়ে,
হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবো সবাই মোরা দেশের তরে
মাতৃভূমি মায়ের ভূমি জন্মেছি এই দেশে,
মরতে পারি এদেশেই যেন, দেশকে ভালোবেসে।

সুর সপ্তক

মোঃ দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী
কলেজ নং ৪১১৪
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক)

সৃষ্টির কোন সোনালী প্রভাতে পৃথিবীতে সঙ্গীত-এর আবির্ভাব হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে এ কথা বলা যায়, সঙ্গীতের আবির্ভাব পৃথিবীর আদি সৃষ্টি থেকে। আর আমরা প্রকৃতি তথা মহাবিশ্বের যে কোন কিছুতে সেখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না কেন, একটু চিন্তা করলেই আমরা সেখানে দেখব এই 'মহাসঙ্গীতকে' সাগরের গর্জনের দিকে কর্ণপাত করলে সেখানে সঙ্গীত, কোকিলের কুহুতান সেখানে পঞ্চম সুর, বৃষ্টির বারি সেখানে তাল, লয়, সুরের সমাবেশ, এমনকি বাতাস পর্যন্ত ঝিড়ি ঝিড়ি রবে আমাদের কর্ণে পৌঁছিয়ে দেয় এক অপূর্ব সুরের রংধনু এমনি করে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেখানে চলছে এই সুর সপ্তক।

গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীত মুচ্যত— শাস্ত্র মতে গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনের সমষ্টিগত নাম হচ্ছে সঙ্গীত। গীত অর্থাৎ কণ্ঠ স্বর এর মাধ্যমে যার প্রকাশ বাদ্য অর্থাৎ সাধারণ যন্ত্র সঙ্গীত, নৃত্য অর্থাৎ নাচ। এখানে আমার আলোচনা কণ্ঠ সঙ্গীত প্রসংগে। আমি আগেই বলেছি যে, সঙ্গীত এর আবির্ভাব কখন এ প্রসঙ্গে বলা কঠিন। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীত যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং এর ভাণ্ডার অসীম। আমাদের সঙ্গীত যে কত পুরাতন তার নিদর্শন পাওয়া যায় হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মূর্তিতে। যেমন সরস্বতী দেবীর হাতে বীণা, সঙ্গীত এর সৃষ্টিকর্তা নীল মহাদেব স্বয়ং নটরাজ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী আমাদের মনে করিয়ে দেয় সঙ্গীত এর আদি সৃষ্টি কোথায়। সাত সুরের সমণ্বয়ে গঠিত আমাদের সুর সপ্তক। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যদি সঙ্গীত এর সাতটি স্বর-এর রূপ বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব প্রতিটি স্বরের সঙ্গে কোন না কোন পশুপক্ষির কণ্ঠস্বর এবং প্রকৃতির ধ্বনীর মিল রয়েছে। যেমন, সঙ্গীতের প্রথম স্বর সরজ ময়ুরের কণ্ঠ স্বর-এর সঙ্গে দ্বিতীয়টি ঋষভ চাতকের, তৃতীয়টি গান্ধার মেষের, চতুর্থটি মধ্যম কাকের, পঞ্চম স্বরটি সঙ্গীতের সব-চাইতে মিষ্টি স্বর কোকিলের, পরের স্বর ধৈবত ব্যাঙের এবং সপ্তম স্বরটি নিষাদ হস্তীর কণ্ঠস্বর-এর সঙ্গে মিল রয়েছে। এই সাতটি স্বর-এর মধ্যে পাঁচটি স্বরের আবার কোমল কড়ি রয়েছে। শুধু তাই নয় শুনলে অবাক হতে হবে, স্বরগুলির আবার প্রত্যেকের কারো তিনটি, কারো দুইটি কারো চারটি করে মোট বাইশটি শ্রুত রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতের স্বর-এর মধ্যগত সুক্ষ্মাংশকে শ্রুতি বলে। সঙ্গীতের এই স্বরগুলি নিয়েই আমাদের সাধনা। এই স্বরগুলি নিয়ে তৈরি হয়েছে পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের মতে দশটি ঠাট। জ্যামিতিতে যেমন কতগুলি বাঁধাধরা নিয়ম বা সূত্র থাকে ঠিক তেমনই আমাদের সঙ্গীতে কতগুলি বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এই নিয়ম সকল শিল্পীকে মেনে চলতে হয়। আর সেটিই হল ঠাট বা মেল। আমি এমনটি অনেক দেখেছি যে একজন হয়ত ভীম পলশ্রী রাগে গান গাইছেন কিন্তু সে জানে না এটি কাফি ঠাটের অন্তরগত। এতে তার অজ্ঞতার পরিচয় খুব সহজেই ফুটে ওঠে। আমরা মনে করি যে, যে কোন শিল্পী সে কাব্য সঙ্গীত-এরই হোক বা উচচাঙ্গ সঙ্গীত-এরই হোক তাকে অন্ততপক্ষে এই দশটি ঠাট জানতে হবে। জ্যামিতি সূত্রই যে জানে না সে আবার জ্যামিতি করবে কি করে। ঠিক তেমনই দশটি ঠাট যে জানে না সে আবার গান গায় কি করে। যাই হোক এই দশটি ঠাটে ভারতীয় উপমহাদেশের বহু রাগ-রাগিনী রয়েছে। এই রাগ রাগিনী আমাদের সঙ্গীতকে করে রেখেছে বিশাল। শুধু এই অঞ্চলে নয় সারা বিশ্বে এই সকল রাগ রাগিনীর আমাদের জন-

প্রিয়তা, ভক্তি অত্যন্ত বেশি। এই উপমহাদেশের সঙ্গীতের যে কোন কলাকে শিখতে হলে এই রাগ-রাগিনীকে বুঝতে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে এবং সাধতে হবে। আমাদের আদি রাগ ছয়টি। মজার ব্যাপার এই ছয় রাগের প্রত্যেকের আবার ছয়জন করে ছত্রিশটি স্ত্রী রাগিনী রয়েছে। এই আদি ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনী ছাড়াও আরো অনেক রাগ-রাগিনী সৃষ্টি হয়েছে। এই নতুন রাগ-রাগিনীগুলোকে আদি রাগ-রাগিনীর বংশধর বলে মনে করা হয়। এই সকল রাগ-রাগিনীর ছায়ায় প্রতিদিনই আমরা বহু গান রেডিও, টেলিভিশনে, ক্যাসেটে শুনছি। সাধারণভাবে এই সকল গানকে আমরা উচচাঙ্গ ও কাব্য এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। উচচাঙ্গ-সঙ্গীতের শাখাগুলির মধ্যে দুই মাধ্যম ধ্রুপদ এবং খেয়াল প্রসঙ্গে বলতে চাইছিলাম। এই ধ্রুপদ এর কথাই ধরা যাক। যারা রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে থাকেন, তারা নিশ্চয় ধ্রুপদ সম্বন্ধে জানেন। ধ্রুপদ উচচাঙ্গ সঙ্গীতের অতি প্রাচীনতম গান। এর অর্থ "যে পদ আদি এবং সত্য।" হিন্দুগুণী শিল্পীদের দ্বারা সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর গানের প্রচার বেশি হয়। এই শ্রেণীর গানে শিল্পীর কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না। বহু নিয়ম নীতি শিল্পীকে মেনে চলতে হয়। এই শ্রেণীর গানে হাল্কা কথা তান বা বিস্তার করার অধিকার নেই এবং গানের গায়কি, ঢং, গম্ভিরা, রাগ-রাগিনীর শুদ্ধতা মেনে চলতে হয়। ভক্তি রসের উপরে এই গানের বাণী থাকে। কিন্তু মুসলমান গুণী শিল্পীরা এক সময় এই অঞ্চলে ধ্রুপদকে ভেঙ্গে গাইতে আরম্ভ করলেন, খেয়াল। খেয়াল শব্দের অর্থ কল্পনা। বিখ্যাত শিল্পী হযরত আমীর খসরু এই খেয়াল গানকে আবিস্কার করেছেন। 'খেয়াল' কিন্তু ধ্রুপদ থেকে অনেক পৃথক! এতে ধ্রুপদ এর মত বাধাধরা নিয়ম নেই। এই শ্রেণীর গানে রয়েছে সুরের মাদকতা গুণী শিল্পীরা নিয়ম নীতি মেনে তাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা ইচ্ছেমত কণ্ঠকে খেলাতে পারেন তান প্রয়োগ ও বিস্তার করতে পারেন এই শ্রেণীর গানে। নজরুল সঙ্গীতে এই শ্রেণীর প্রভাব রয়েছে প্রচুর। উচচাঙ্গ সঙ্গীতের ধ্রুপদ ও খেয়াল ছাড়া আরো শাখা রয়েছে। বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় গজলকে আমরা উচচাঙ্গ সঙ্গীতের একটি শাখা উর্দু ক্ষুদ্র গীতকে বলতে পারি। গজলে শিল্পী তার মনের মত করে সুরের ব্যবহার ও ছোট বিস্তার এবং তান করতে পারে। এই সামান্য পরিসরে বিশাল উচচাঙ্গ সঙ্গীতের বর্ণনা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

এবার বলছিলাম কাব্য সঙ্গীতকে। কাব্য সঙ্গীত বলতে আমি এখানে শুধু মাত্র বাংলা কাব্য সঙ্গীতকে বলতে চাই। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ গানকে ভালবাসে। কিন্তু বাংলা-দেশের মানুষ যেন বাস্তবিক গানকে একটু বেশি ভালবাসে। এখানে প্রকৃতি আর মাটি যেন কথা বলে। আর তাই এখানে জন্ম নিয়েছেন বহু সঙ্গীত সাধক। সুর স্রষ্টা হিসাবে জন্ম নিয়েছেন লালন ফকির, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ। এ দেশের গান জারী, সারী, ভাটিয়ালী, পল্লী-গীতি। বাংলায় সৃষ্টি হয়েছে অতুলপ্রসাদী রজনীকান্তের গান দিজেন্দ্রগীতি শ্যামা সঙ্গীত। আমাদের সঙ্গীতের দুই চন্দ্র সূর্য রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল। রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং নজরুল সঙ্গীত আজ সারা বিশ্বে প্রায় পরিচিত। এদেশের প্রতি ঘরে ঘরে এর চর্চা। রবীন্দ্র সঙ্গীতে রয়েছে ধ্রুপদ এর প্রভাব এটি আগেই বলেছি। ভারতীয় উচচাঙ্গ সঙ্গীতের সুর সুন্দরভাবে সংমিশ্রণ করে, কবিগুরু রবীন্দ্রসঙ্গীতকে উচচাঙ্গ কাব্য সঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন রবীন্দ্র সঙ্গীতে এর গায়কী এবং ভাবধারা সকল শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পক্ষান্তরে নজরুল সৃষ্টি করেছেন বাংলা ভাষায় উচচাঙ্গ ধরনের রাগ প্রধান গান। তিনি বাংলা গানে রাগ সঙ্গীত, গজল, কাওয়ালী, কির্তন, শ্যামা সঙ্গীত, ঠুমরি এমন কি আরবী সুরকে সংমিশ্রণ করেছেন। নজরুল তার গানে

ক্লাসিকেলকে দেখিয়েছেন। তার গানে রয়েছে বাণী বিস্তার এবং শিল্পীর ক্ষমতাকে দেখানোর সুযোগ। তার সৃষ্ট রাগ রাগীনির মধ্যে "দোলন চাঁপার" কথা না বল্লেই নয়। বাংলা গানে অতুল প্রসাদ ও রজনীকান্তের অবদানও স্মরণীয়। গানের দেশ বাংলাদেশ। প্রতিদিনই এখানে বহু গান রচনা হচ্ছে ও গাওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইদানিং আমরা যেন একটু বেশি প্রাশ্চাত্যের দিকে ঝুকে পড়েছি। আমরা যেন নিজেদের সঙ্গীত সংস্কৃতি ছেড়ে বিদেশী ড্রামের বিটের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গীত পাশ্চাত্য দেশগুলির চাইতে কোন অংশে খারাপ নয় বরং ভাল। আমাদের যে সব পুরোনো গান আছে, এই ধরুন অতুল প্রসাদী বা অন্য যে কোন গান সেগুলোকে বর্তমানের এই সকল গানের সঙ্গে তুলনা করুন তাহলে এই সম্বন্ধে সকলেই বুঝতে পারবেন এবং স্বীকার করবেন যে পুরোনো গান ছিল অনেক ভাল। বর্তমানে ভাল গান একেবারে হচ্ছে না সেটি বল্লে ভুল হবে। বর্তমানেও গান হচ্ছে কমবেশি কিছু শিল্পীর কণ্ঠে। আর এই কথা সত্য যে আধুনিক গানও ক্লাসিক হতে পারে। এবং সেটির মান হয় অনেক উন্নত। আমাদের যারা সঙ্গীত রসিক রয়েছেন এবং শ্রোতা রয়েছেন তারা সকলে তৎপর হলে এবং এগিয়ে এলে আমাদের সঙ্গীতের পরিচ্ছন্নতা আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সুন্দর রুচিবোধ, আর প্রয়োজন, শিল্পীর গুণী এবং সৎ গুরুর কাছে শিক্ষা ও উপযুক্ত সাধনা। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংঘ, রেডিও টেলিভিশন সুস্থ রুচিবোধ সৃষ্টির জন্য সহযোগিতার হাত প্রসার করতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমাদের "রেসিডেনসিয়েল মডেল কলেজের" কথা উল্লেখ-যোগ্য। এখানে শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে সংস্কৃতি চর্চার ব্যাপারে। ফলে আমরা যারা সংস্কৃতি মনা রয়েছি তারা পড়ার ফাঁকে শুধু সঙ্গীতেই নয় সকল সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পাড়ছি। আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

ভাষার যেখানে শেষ, গানের সেখানে শুরু। আর এই গানের জন্য আমাদের দশটি ঠাটকে জানতে হবে, রাগ রাগিনীকে শিখতে হবে, সুর সপ্তককে জানতে হবে, সাধতে হবে। তবেই আমাদের গান হবে। এবং সত্যিকারের শিল্পী হওয়া যাবে। এছাড়া আজকাল বাসের কণ্ডাক-টারও তো বড় ওস্তাদ। ফুলের যেমন রূপরস গন্ধ রয়েছে সঙ্গীতেরও তেমনই রূপ রস গন্ধ রয়েছে।

সঙ্গীত একটি শিশুর মত পবিত্র। সঙ্গীতকে যারা ভাল বাসেন তাদের মনমানসিকতা আলাদা গভীরতা এত যে বেশি সামান্য আলোচনায় এবং আমার মত সাধারণ শিল্পীর পক্ষে এর বর্ণনা দেওয়া এবং অনুভব করা সম্ভব নয়, সুর হচ্ছে শিব, সুন্দর, অসুর হচ্ছে দানব। অসুরকে পরাজিত করার জন্য সুরের সৃষ্টি। আর এই ভাবেই চলছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সুর সপ্তকের খেলা।

কুদরত-ই-খুদা হাউস

হাউস মাষ্টার : এ.বি.এম আবদুল মান্নান মিয়া
হাউসটিউটর : মোঃ ওবায়দুল্লাহ
হাউস আবসিক-শিক্ষক মোঃ রফিকুল ইসলাম
হাউস এলডার : ৪০০৮ মাষ্টার হায়াতুন নবী
হাউস প্রিফেক্ট : ৩২৯৭ মাষ্টার মোঃ আরিফ আমীন

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের প্রতিষ্ঠা লগ্নের সহযাত্রী জিন্নাহ হাউস, স্বাধীনতার পরে ১ নম্বর হাউস এবং সর্বশেষে বাংলার কৃতি সন্তান ম্লান-তাপস আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী স্বনামধন্য ডঃ কুদরত-ই-খুদার নামানুসারে এ ছাত্রাবাসটির নাম করণ করা হয় "কুদরত-ই-খুদা হাউস"। দেশের এক মহান জ্ঞান তাপসের নামে আমাদের হাউসের নামকরণে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের হাউস নামে পরিচিত যে ৫টি ছাত্রাবাস আছে, তার মধ্যে কুদরত-ই-খুদা হাউসটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ব বৃহৎ। এ হাউসের আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা প্রায় দু'শো। আরো কিছু অনাবাসিক ছাত্রও এ হাউসের সাথে সংযুক্ত আছে। ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররা এখানে বাস করে। এদের বয়স ৫ বছর থেকে ১১ বছরের মধ্যে। এ বছর এ হাউস থেকে ২৭ জন ছেলে বড়দের শাখার স্থানান্তরিত হয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে ৫৫ জন নতুন ছেলে এ হাউসে এসেছে। এ হাউসটি বয়সের দিক দিয়ে প্রাচীন, আকার আয়তনে বিশাল এবং এখানে নবাগত ছাত্রের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই এ-হাউসের সমস্যাও বেশী। কিন্তু সকলের আন্তরিক ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় এ হাউস সব সমস্যা জয় করে চলছে।

আধ ফোটা ফুলের কুঁড়ি ন্যায় ছোট, সুন্দর নিষ্পাপ কোমল মতি শিশুরা পরিবারিক সম্পর্কের মধুময় আবেষ্টনী ছেড়ে এখানে এসে প্রথমাবস্থায় জল থেকে ডাঙায় তোলা মাছের মত বেশ একটু অস্থির হয়ে পড়ে, তার পর এখানে নতুন নতুন বন্ধু পায় এবং তাদের সাথে মিলে মিশে নতুন জীবন শুরু করে। ক্রমে ক্রমে তারা স্বাবলম্বী সময়ানুবর্তী ও নিয়মানুবর্তী হয়ে ওঠে। নিজের লকার, বিছানা, জামা কাপড় গোছানো থেকে শুরু করে সব রকম ছোটখাট কাজ নিজের হাতেই নিপুণভাবে করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অনেক বেলায়ও যে, ছেলেটির ঘুম ভাঙতোনা, সে ছেলেটিই কাকভোরে ওঠে—নারিবদ্ধ ভাবে মাঠে চলে যায়, প্রাতঃকালীন শরীর চর্চা, করে। সব কাজেই অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা ছোটদের সাহায্য সহায়তা করে।

এ কলেজের ছাত্রাবাসগুলোর প্রশাসনের বৈশিষ্টই হলো ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসন, উদ্দেশ্য ছাত্রদের মধ্যে সুষ্ঠু ও যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। ছাত্রদের সাথে পরামর্শক্রমে হাউস কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড গঠন করে। প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড ছাত্রদের শাসক নয়, সহায়ক ও পথ প্রদর্শক। হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর ও মেট্রনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এখানকার যাবতীয় কর্মসূচী শুরু হয়, কিন্তু প্রায় প্রতিটি কাজের দায়িত্বে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত থাকে প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ডের ছোট্ট অথচ সুদক্ষ সদস্যবৃন্দ। মর্নিং পিটি, সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার, বিশ্রাম, বৈকালিক চা, খেলা ধুলা, দুধ পান নৈশকালীন পাঠ প্রস্তুতি, নৈশ ভোজ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, নিদ্রা সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব এদেরকেই গ্রহণ করতে হয়। ছেলেদের সহযোগিতার জন্যই ওয়ার্ড বয় ও টেবিল বয়দের কাজ সহজ হয়। সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা কর্ম-ব্যস্ত দিন বুধবার। আন্তঃ হাউস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিন। এ দিন হাউসের সর্ব কনিষ্ঠ সদস্যটির কর্ম তৎপরতারও সীমা থাকে না, নিজ হাতে কাজ করে তারা তাদের জীবন পাতায় প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা যোগ করে।

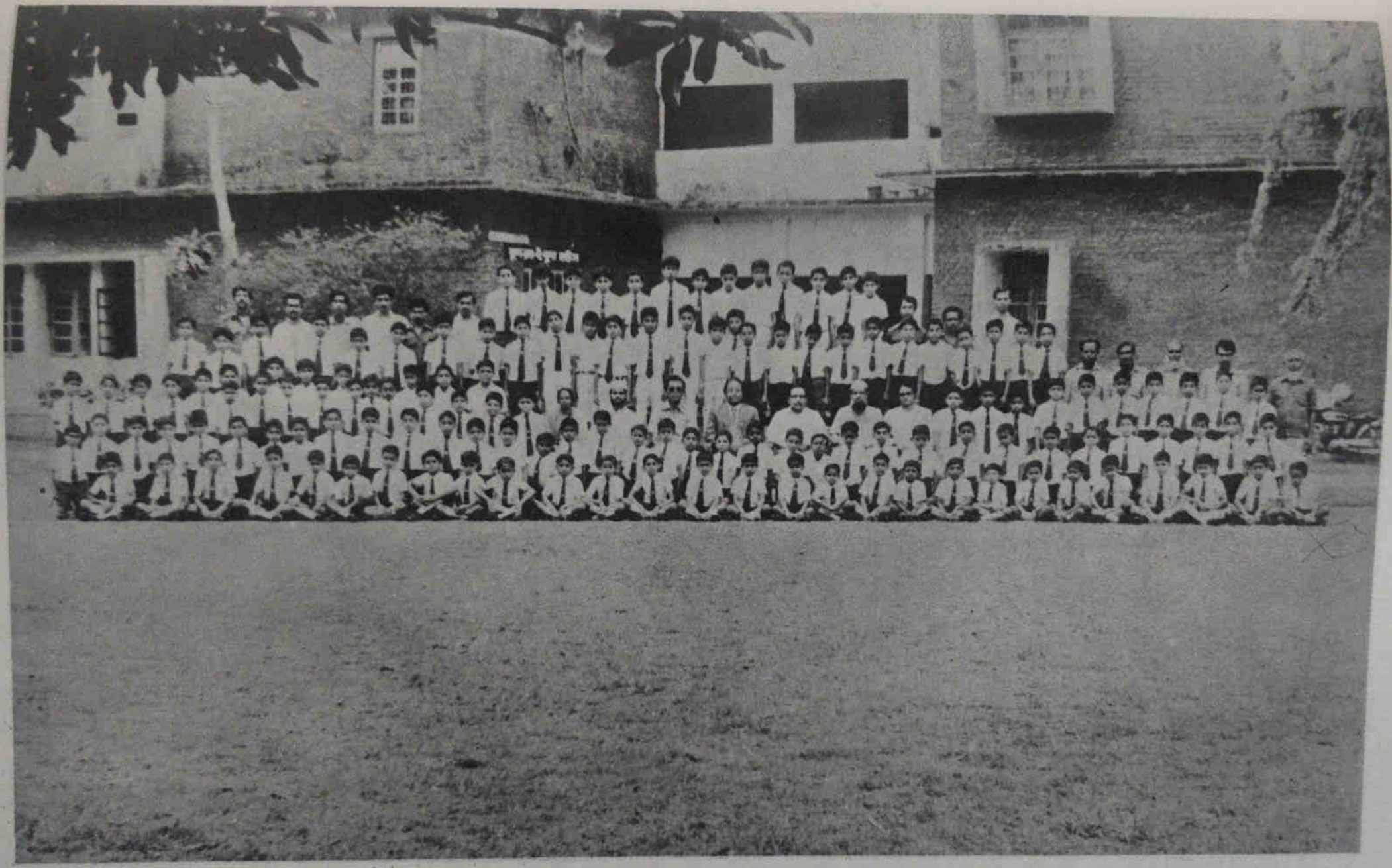

কুদরত-ই-খুদা হাউস

কে জানে আজকের এ ক্ষুদে নেতাদের মাঝে লুকিয়ে আছে আগামী দিনের কোন বিরাট নেতৃত্ব।

শুধু নেতৃত্বই নয়, খেলাধুলা, চারু ও কারুকলা, আযান, কিরাতসহ নানা রকম শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান এই বিদ্যা পীঠ।

এখানে এসব বিষয় নিয়মিত প্রতিযোগিতা হয়। এ হাউস আযান কিরাতে এক সুমহান ঐতিহ্যসৃষ্টি করেছে। উপর্যুপরি কয়েক বছর ধরে এ হাউস আযান কিরাতে চ্যাম্পিয়ন। এ হাউসের ছাত্র মাহবুবুল হক একাধিক বছর আযান কিরাতে শাখা শ্রেষ্ঠ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ১৯৮৬ সনে আমীরুল ইসলাম টেবিল টেনিসে, শরীফুল ইসলাম দাবায়, ৮৫ সনে নাসির আহমেদ দাবায়, তানবিরুল ইসলাম টেবিল টেনিসে, ৮৪ সালে মুস্তাফিজুর রহমান দাবায়, গোলাম মহীউদ্দীন ক্যারামে, ৮৩ সনে মাহবুবুর রহমান টেবিল টেনিসে, এরা সবাই ব্যক্তিগত ভাবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করে। ১৯৮৫ সনের সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্র এ.কে.এম. বাশার গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়।

কলেজের অভ্যন্তরেই নয়, বাহিরে, এমন কি জাতীয় পর্যায়-ও এ হাউসের ছেলেরা স্বর্ণোজ্জল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। জিয়াউর রহমান ও এ.কে.এম. বাশার ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে পুরস্কৃত হয়েছে। ৪০৬৩ মোস্তাক সারওয়ার, ৩য় শ্রেণী, ব্রিটিশ কাউন্সিলের আর্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করে এ-কলেজের জন্য এক দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছে।

লেখা পড়ায়ও এ হাউসের ছেলেরা তাদের মেধা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ৪১৮৪ মোঃ রুবায়তুল ইমাম, ১৯০৫ ফাহীম আজাদ শ্রেণীতে ১ম হয়েছে। ৪২২১ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান ১ম শ্রেণী, ১৯৮৬ সনে এবং ২৮১৬ এ.কে.এম বাশার, ৬ষ্ঠ শ্রেণী, ৮৫ সনে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

১৯৮৬ সনে এ হাউস সামগ্রিকভাবে চ্যাম্পিয়ন না হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছে এবং এর পূর্বে কয়েক বার চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। এ হাউস তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে দৃঢ় সংকল্প।

এ হাউসে বর্তমানে যে, এক সুস্থ, সুন্দর, সুষ্ঠু, মধুময় পরিবেশ বিরাজ করছে এবং যে, অপরিসীম কর্ম তৎপরতা চলছে তা এককভাবে কারও কৃতিত্ব নয়, হাউস মাস্টার থেকে শুরু করে ঝাড়ু দার পর্যন্ত সকল কর্মচারী ও ছাত্রদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায়ই তা' সম্ভব হয়েছে, এ জন্য সবার প্রতি রইল অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা সফল করুন। আমীন।

জয়নুল আবেদীন হাউস

হাউস মাস্টার : জনাব এ.টি.এম. জালালউদ্দীন
হাউস টিউটর : জনাব নূরুল ইসলাম ভূঁইয়া
হাউস এল্ডার : মাস্টার মোঃ আতিকুর রহমান
হাউস প্রিফেক্টঃ মাস্টার মোঃ আশরাফ উদ্দীন ভূঁইয়া

জয়নুল আবেদীন হাউস ঢাকা রেসিডেন-সিয়াল মডেল কলেজের একটি ঐতিহ্যবাহী আবাসিক ভবন। ১৯৬১ সনের ১লা মে এই ছাত্রাবাসটির জন্ম। জন্মলগ্ন থেকে ছাত্রাবাসটি তার নিজস্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে আছে। লেখাপড়া, হাউস ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে খেলাধূলা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এ হাউসের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতি বছরই জয়নুল আবেদীন হাউসের প্রতিটি শ্রেণীতে কয়েকজন ছাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পরিচয় দিয়েছে। ১৯৮৬ সনের তৃতীয় পাবিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর মাস্টার মোঃ নূর ই আলম তৃতীয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর তানভীর আহসান সিদ্দিকী দ্বিতীয় এবং আ.ফ.ম. তানভীর আহসান তৃতীয় স্থান অধিকার করে। তৃতীয় শ্রেণীর গোলাম ওয়ায়েজ প্রথম এবং মাহবুবর রহমান তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর শাইয়ান রহমান প্রথম, পঞ্চম শ্রেণীর মাস্টার মোঃ আতিকুর রহমান প্রথম এবং আতাউল মোর্শেদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

তাছাড়া খেলাধূলায় ১৯৮৪, ৮৬ এবং ৮৭ প্রতিটি সনেই এ হাউস চ্যাম্পিয়নশীপ লাভের গৌরব অর্জন করেছে।

আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকেও হাউসটি প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের হাউসের গৌরব অতুলনীয়। ১৯৮৩ ৮৪, ৮৫, ৮৬ এবং ৮৭ প্রতি বছরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন হবার সৌভাগ্য লাভ করে। বলাবাহুল্য ১৯৮৬-৮৭ সনে শুধু মাত্র আযান-কিরাত ছাড়া সবকটি বিষয়ে পূর্ণ পয়েণ্ট নিয়ে জুনিয়র শাখায় জয়নুল আবেদীন হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়ে এক অভূতপূর্ব সাফল্য লাভের গৌরব অর্জন করেছে।

এ হাউসের হাউস মাস্টার এবং হাউস টিউটর অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ। তাদের মিষ্ট কথার বকুনীতে এ হাউসের ছেলেরা যেন আরও চঞ্চল উৎফুল্ল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠে।

গান, কবিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এর সুনাম লক্ষ্যণীয়। গানে মোঃ নুর-ই-আলম ও আহমেদ আফজল এবং আবৃত্তি ও নাটকে মোঃ আতিকুর রহমান সকলের কাছে পরিচিত।

জয়নুল আবেদীন হাউসের বিভিন্ন সমস্যাও রয়েছে। এর দ্বিতল ভবনের একটা অংশ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্তমানের ছাত্র সংখ্যা পূর্বের ছাত্রসংখ্যার দ্বিগুণ হওয়ায় হাউস-টিকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

জয়নুল আবেদীনের হাউসের যা গৌরব তা কারও একক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি নয়। সামগ্রিক ভাবে আবাসিক, অনাবাসিক ছাত্র, সকল শ্রেণীর কর্মচারীর ও কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, অন্তরিকতা ও সহযোগিতা এ হাউসের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করছে।

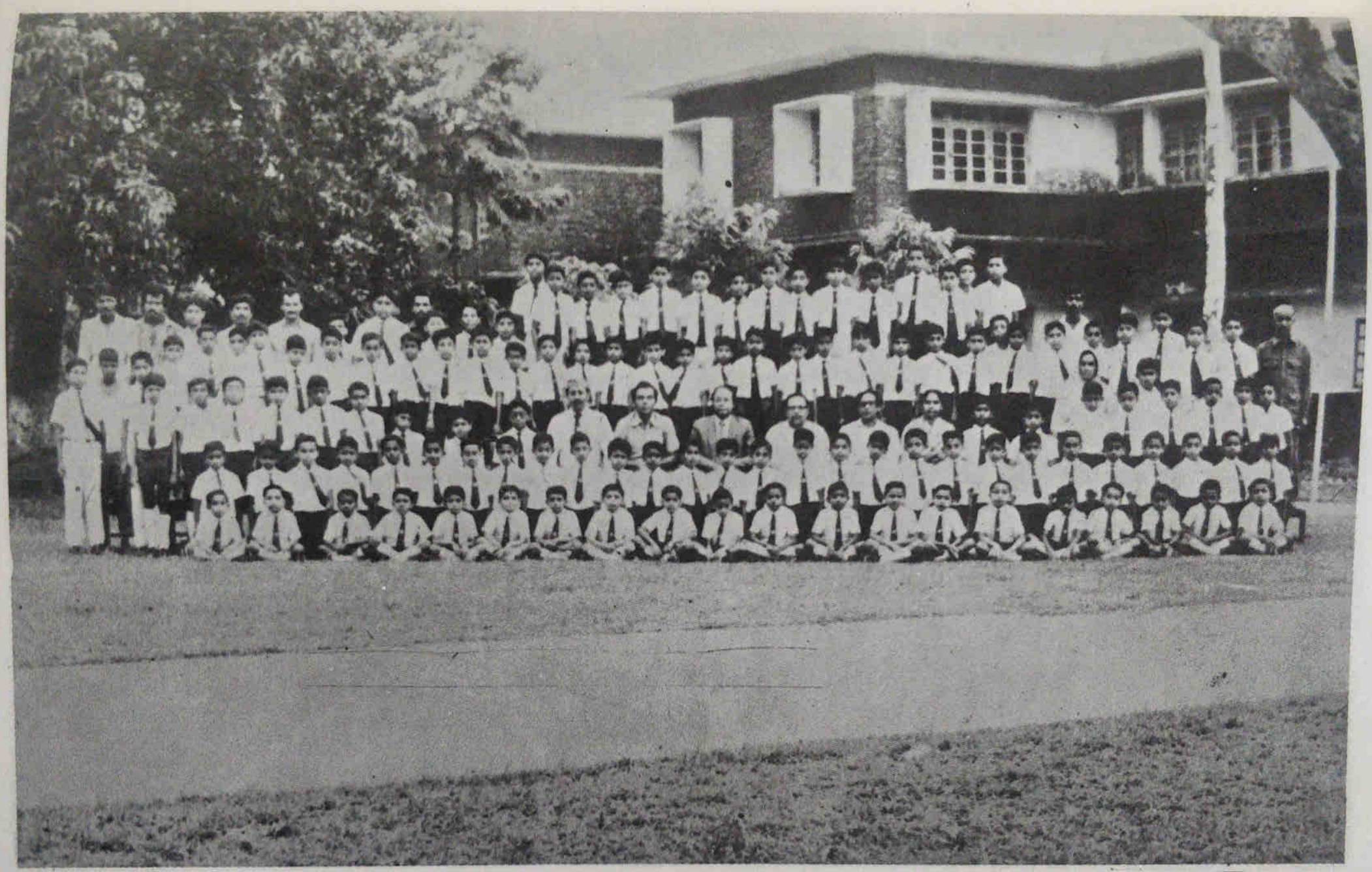

জয়নুল আবেদীন হাউস

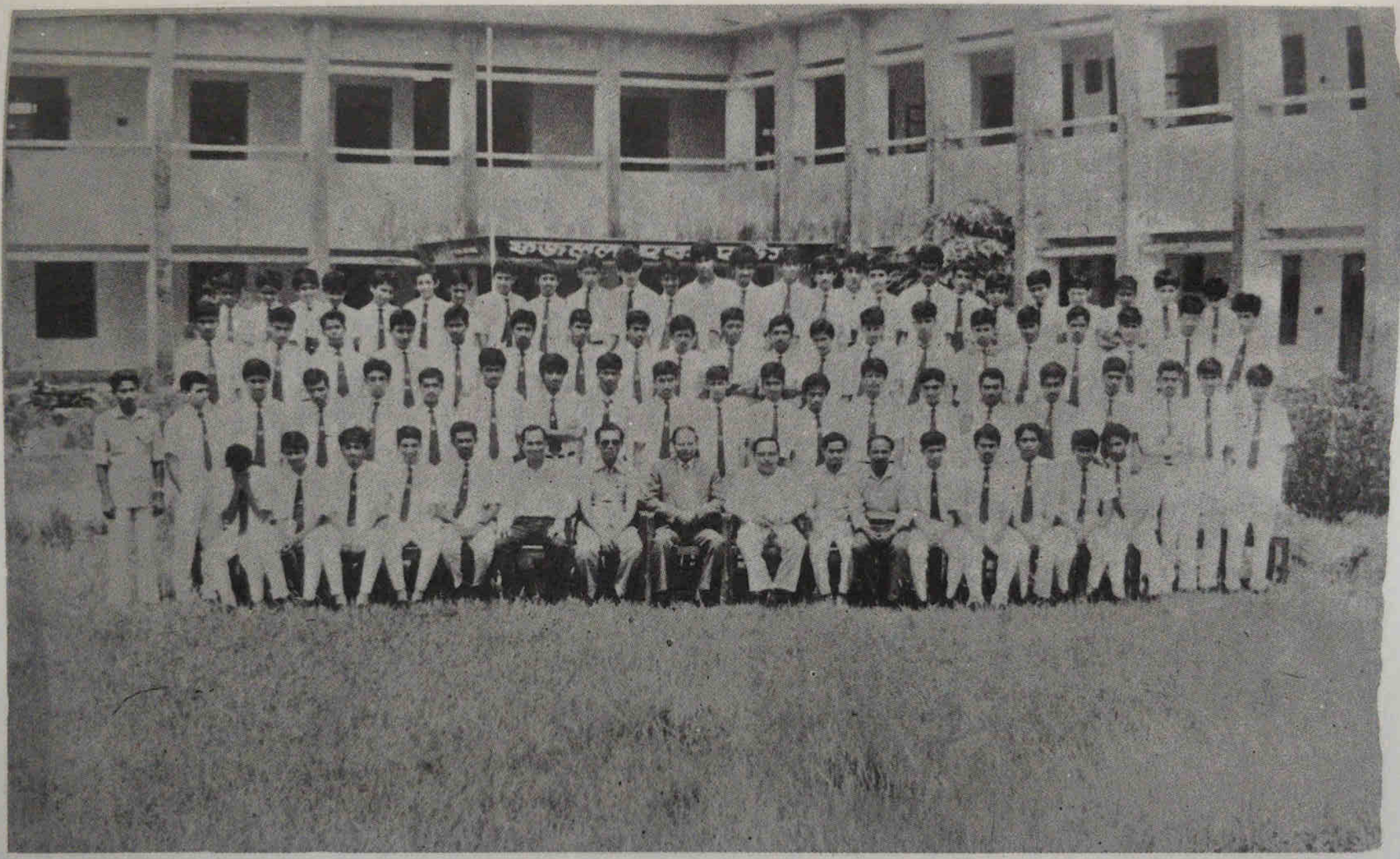

ফজলুল হক হাউস

ফজলুল হক ছাত্রাবাস

হাউস মাস্টার : জনাব ফয়জুর রহমান
হাউস টিউটর : জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফা
হাউস এলডার : মাস্টার গোলাম মোহায়মেন
হাউস প্রিফেক্ট : মাস্টার ওয়াহেদুল আরেফিন

কৈশোরের প্রান্ত লগ্নে হাউসে এসে যৌবনের শুরুতে তার প্রত্যাবর্তন। এভাবেই কেটে যায় বড়দের শাখায় ছাত্রদের জীবন। জীবন চলার পথে অগ্রসরমান পথিকটি নিয়ে যায় তাদের হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর এবং হাউসের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতেকটি ব্যক্তির প্রাণঢালা স্নেহ ও অকৃপণ শুভেচ্ছা।

শেরে বাংলা ফজুল হকের নামানুসারে নামকরণ হওয়ায় হাউসের প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে তাঁর চরিত্রের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ হাউসের ছাত্ররা সর্বক্ষেত্রেই দেখিয়েছে তাদের পারদর্শিতা।

জ্ঞানার্জন প্রত্যেকটি ছাত্রেরই সর্ব প্রধান কর্তব্য আর সেজন্যই আমাদের হাউসের ছাত্ররা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় আসন লাভ করে নিজেদের যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি তারা হাউসের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ। পূর্ব সুরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে '৮৩ এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় আবুল কাশেম মোহাম্মদ সালেক, মাহবুব হাসান, মিজানুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন, '৮৪তে তানভির হাসান, মোঃ সানাওল হক, '৮৬তে মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের হাউসের মাসুদ পারভেজ মেধা তালিকায় আসন লাভ করে। এ হাউসের ইতিহাস এর বুকে রেখে গেছে তাদের সফল্যের স্বাক্ষর; প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে যতবার আমাদের এ শিক্ষা নিকেতনের ছাত্ররা মেধা তালিকায় স্থান অধিকার করেছে ততবারই ফজলুল হক ছাত্রাবাসের ছেলেরা ছিল শীর্ষে। এ হাউস তার অতীত গৌরব নিয়েই তৃপ্ত নয় জিয়াউর রহমান, মাহবুবুর রহমান, সাজ্জাদ হোসেন, বিপুবকুমার ধর, আনওয়ারুল করীম, বদরুল আলম এবং আরো অনেক মুখ হতে দেশের সোনালী ভবিষ্যৎ এ হাউসের কাম্য।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যায়ই আমাদের জীবন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের হাউসের ছাত্ররা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং ক্রীড়াঙ্গনেও রেখেছে তাদের দৃপ্ত পদক্ষেপের চিহ্ন। ১৯৮৭ সালের সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় প্রথম হবার গৌরব অর্জন করেছে। শুধু মাত্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমাদের সাফল্য সীমাবদ্ধ নয় '৮৬ সালে বড়দের শাখায় "ইনডোর গেমস"-এ আমাদের গোলাম মহিউদ্দীন—কেরামে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছে।

শুধুমাত্র কলেজের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতেই নয়, জাতীয় পর্যায় অংশগ্রহণ করার গৌরবেও এরা অভিষিক্ত। আমাদের এক ভাই সপ্তম শ্রেণীর জুলহাস মান্নান ব্রিটিশ কাউন্সিল আয়োজিত নৃত্য প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক লাভের গৌরব অর্জন করেছে।

খেলাধূলায় এ হাউসের রয়েছে একটি স্বর্ণালী অতীত এবং সুবিশাল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। '৮৭ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউসের ছাত্র এ, কে, এম, হাবিবুর রহমান সিনিয়র গ্রুপে "গ্রুপচ্যাম্পিয়ন" এবং কলেজের "শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ" হয়ে এ হাউসের মর্যাদাকে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফুটবলে—ওয়াহেদুল আরেফিন, সাইদুর রহমান তানভির, আবু তাহের। ভলিবলে—ফরিদ আহমেদ সাইদ হাসান। ক্রিকেটে—গোলাম মোহায়মেন, ওবাইদুল্লাহ হাফিজ, সাজ্জাদ হোসেন। হকিতে—ফরিদ আহমেদ, মোর্শেদ সালাম ও মোবাশ্বের সালাম এবং বাস্কেট বলে—আনিসুর রহমান খান, মামুনুর রশিদ খান, সালাউদ্দিন প্রশংসনীয় অবদানের জন্য কলেজ পরিমণ্ডলে বিশেষ ভাবে স্বীকৃত।

আমাদের গৌরব শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়েই আবদ্ধ থাকেনি। "দশে মিলে করি কাজ হারিজিতি নাহি লাজ" নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে আমরা সমষ্টিগত ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব। '৮৬-তে আন্তঃ হাউস প্রতিযোগিতায় আমাদের হাউস চ্যাম্পিয়ন হবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছে। '৮৬ প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ :

প্রতিযোগিতার নাম	পয়েন্ট তালিকা
লেখাপড়া	২
ইনডোর গেমস	২
আউট ডোর গেমস	৩
এথলেটিক্স	৩
হাউস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও মার্চপাষ্ট . .	১
আযান ও কেরাত	৩
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দেয়াল পত্রিকা . . .	২
	১৬

১৯৮৬ সাল আমাদের জন্য সাফল্য বয়ে আনলেও '৮৭ সালের একটি দুর্ঘটনায় আমরা সবাই শোকে মূহ্যমান। গত ৩১ শে মার্চ, মঙ্গলবার, ১৯৮৭, আমাদের হাউসের আবাসিক ছাত্র নবম শ্রেণীর সৈয়দ তৌহিদ হোসেন কলেজ নং ২৯৬৪ কলেজের পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে অকাল মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করেছে (ইন্না-লিল্লাহে...রাজেউন)। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তালার কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন তাঁর আত্মাকে শান্তি প্রদান করেন। তাঁর শোকাভিভূত পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা জানাই আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি।

বর্তমানে হাউসে ৮৬ জন ছাত্র অবস্থান করছে বছরান্তে একদল নতুনকুঁড়ি আসছে এবং একদল বিদায় নিচ্ছে। ছোট বড় সকল ছাত্র হাউস মাস্টার হাউস টিউটর এবং অন্যান্য সবাইকে নিয়ে আমরা একটি পরিবার। স্নেহ ও প্রীতির অদৃশ্য অবিচ্ছেদ্য এক বন্ধনে আবদ্ধ আমরা সবাই। বাংলার বাঘ শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের মহান ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবীন প্রাণের উচ্ছ্বাসবেগে সকল বাধা বিপত্তিকে ডিঙিয়ে দিয়ে আমরা এগিয়ে যাব আমাদের অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে, এই হোক আমাদের সবার হৃদয়ের ঐকান্তিক কামনা।

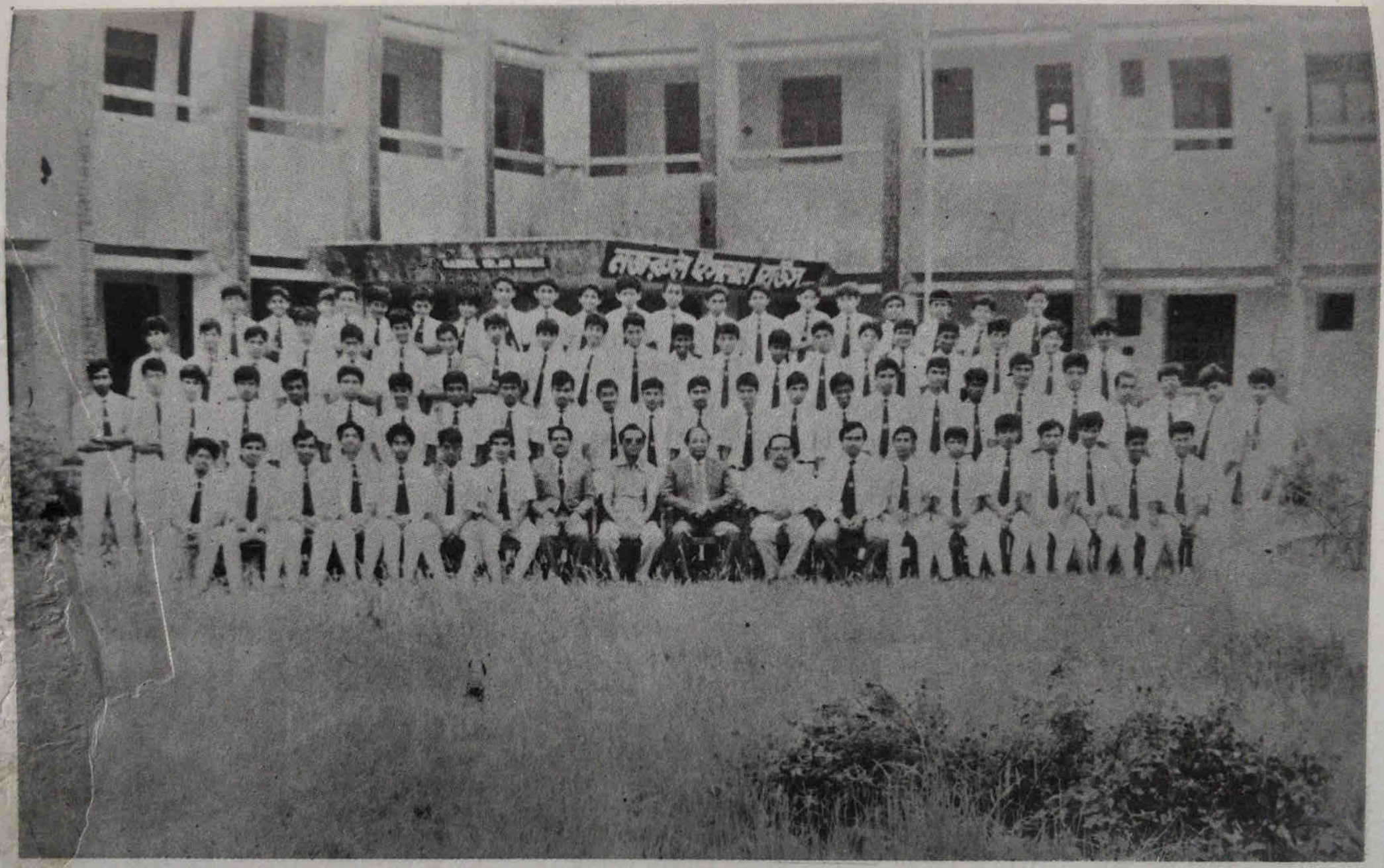

নজরুল ইসলাম হাউস

নজরুল ইসলাম হাউস

হাউস মাস্টার : জনাব মোঃ গোলাম মুর্তজা
হাউস টিউটর : জনাব আবদুল মোমেন খান
হাউস এল্ডার : রাশেদ জুলভী
হাউস প্রিফেক্ট : শহীদ জাকিউদ্দিন।

উধার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা ঘুচাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

চির তারুণ্যের প্রতিচ্ছবি অমর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ছাত্র জীবনে তাঁর ভাবাদর্শকে জাগরিত করার উদ্দেশ্যে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের এই ছাত্রবাসটির নামকরণ করা হয়েছে নজরুল ইসলাম হাউস। প্রতিভাময় এই কবির জীবন আদর্শে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে এ হাউসের ছাত্রবৃন্দ এ কলেজের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাউসের পতাকা সমুন্নত রাখছে। কবির জীবনাদর্শ এই হাউসের ছাত্রদের ন্যায় ও সত্যের প্রতি মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি করেছে।

ইংরাজী অক্ষর 'L' আকৃতি বিশিষ্ট দ্বিতল এই হাউসের প্রবেশ পথেই হাউসের নাম ফলক চোখে পড়ে। হাউসের সামনে রয়েছে সুশোভিত পুষ্প উদ্যান। বাগানে ফুটে রয়েছে অজস্র নানাজাতের ফুল। রাত্রিকালে রজনীগন্ধা হাসনাহেনা ফুলের সুবাসে হাউসের বাতাস থাকে আমোদিত। উদ্যানের গোলচক্করের মাঝে অবস্থিত সুদীর্ঘ তালবৃক্ষটি বাগান ও হাউসের সৌন্দর্যকে আরও বর্ধিত করেছে। বাইরে থেকে হাউসটি যেমন ছবির মত সুন্দর মনে হয় তেমনি এর ভিতরে রয়েছে সুসজ্জিত প্রতিটি কক্ষ।

হাউসের ছাত্রদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটরের স্নেহময় শাসন এবং হাউসকর্মীদের আন্তরিক সেবাযত্ন ছাত্রাবাসটিতে পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাইতো ছুটির দিনগুলোতে সহজে বাড়ী যেতে মন চায়না।

বর্তমানে এ হাউসের ছাত্রদের আসন সংখ্যা ৯৬। এছাড়া সমপরিমাণ অনাবাসিক ছাত্র এর সঙ্গে সংযুক্ত আছে। আবাসিক ও অনাবাসিক সকল ছাত্রই হাউসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমানভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাউসের সুনাম ও ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে।

নজরুল হাউসের ছাত্রবৃন্দ কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতি বছর বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৪, ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে নজরুল হাউস "হাউস চ্যাম্পিয়ন" হবার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছে। ১৯৮৭ সালে মাত্র একপয়েন্টের ব্যবধানে এ হাউস 'রানার্স আপ' হয়েছে। আমাদের হাউসের শহীদ জাকিউদ্দিন কলেজ ক্রিকেট দলে এবং আনিসুর রহমান ও রাশেদ জুলভী কলেজ ফুটবল দলে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এ হাউসের কৃতিছাত্র ইকবাল রাকিব ১৯৮৬ সালে জুনিয়র দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে হাউসের সুনাম বর্ধিত করেছে। এই হাউসের প্রাক্তন ছাত্র মাস্টার আমিনুল ইসলাম জাতীয় যুব হকিতে, মাস্টার খাজা রহমতুল্লাহ্ জাতীয় হকি দলে, মাস্টার আফতাব মোল্লা জাতীয় এথলেটিকসে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। প্রাক্তন ছাত্র মাসুদ হাসান রাব্বু ও মোঃ হাসান মামুন এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে, হাউস ও কলেজের জন্য সুনাম অর্জন করেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলীর উৎসাহ ব্যঞ্জক উপদেশাবলী এ হাউসের ছাত্রদের কর্মপ্রেরণার উৎস ও পথনির্দেশ। তাদের মূল্যবান উপদেশ শিরধার্য করে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নিকট এই প্রার্থনা মহানকবির জীবন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি। এ হাউসের প্রাক্তন ও বর্তমান সকল ছাত্র যেন জীবনকে সুন্দর ও সার্থকভাবে গড়ে তুলতে পারি খোদার নিকট আমাদের এই নিবেদন।

লালন শাহ হাউস

হাউস মাস্টার : জনাব কাজী রেজাউল ইসলাম
হাউস টিউটর : জনাব নজরুল ইসলাম জায়গীরদার
হাউস এলডার : মাস্টার মামুনুর রশীদ
হাউস প্রিফেক্ট : মাস্টার আসানুল হক

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কলেজের ছাত্রাবাসগুলির ভূমিকা অনন্যসাধারণ। এই ছাত্রাবাসগুলি, যাদের বলা হয় হাউস, ছাত্রদের কাছে একান্ত তাদের আপন বাসগৃহের মত প্রিয়। এখানে অবস্থানকালে তারা এক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে আগামী দিনের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযোগী পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে উঠার শিক্ষা লাভ করে থাকে।

এই হাউসগুলির মধ্যে নূতন সংযোজন লালন শাহ হাউস, ১৯৭৮ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর তদানীন্তন অধ্যক্ষ জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ এই হাউসের উদ্বোধন করেন। সে সময় এই হাউস ৩ নং হাউস হিসাবে পরিচিত ছিল। পরবর্তিতে বিখ্যাত বাউল কবি ও গীতিকার লালন শাহের নাম অনুসারে এই হাউসের নামকরণ করা হয় "লালন শাহ হাউস।" এই মহানকবির উদার ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিবাদী মনোভাব, অকুণ্ঠ মানবপ্রীতি এ হাউসের কিশোর তরুণ প্রতিটি ছাত্রকে করেছে উদ্দীপ্ত, করেছে অনুপ্রাণিত। তাই পারিবারিক পরিবেশে আশ্রিত এ হাউসের প্রতিটি ছাত্র এক নিবিড় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। জন্মলগ্ন থেকেই লালন শাহ হাউস তার স্বকীয়তা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে পূর্বের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে এগিয়ে চলেছে সমতালে অন্যান্য হাউসের সাথে। চলার পথে এর দৃঢ় পদক্ষেপ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সকলের। লালন শাহ হাউস আজ একটা বলিষ্ঠ সম্ভাবনাময় নাম। তাই লালন শাহ হাউস বলতে ছাত্রদের বুক ফুলে উঠে এক গভীর আবেগে।

বর্তমানে এ হাউসের ওপর তলা ও নীচ তলা মিলে মোট ৬টি সেকশন এবং ১৪টি বিশেষ কামরায় সর্বমোট ৯০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়াও কিছু অনাবাসিক ছাত্র এ হাউসের সাথে যুক্ত আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনোরম পরিবেশে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা প্রতিটি মুহূর্তে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠার সাধনা নিয়ে লেখাপড়া, প্রাতঃকালীন শরীর চর্চা, বৈকালিক খেলাধূলা, নামাজ প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করছে। এসব কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতেই সকাল থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। কর্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা এই হাউসের ছাত্রদের চরিত্রে আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। প্রত্যেক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এ হাউসের ছাত্ররা। গত বছর এ হাউসের ছাত্র মাসুদ হাসান ও রফিকুল ইসলাম কলেজের সেণ্ট্রাল প্রিফেকটোরিয়াল বোর্ডের যথাক্রমে কলেজ এলডার ও কলেজ ক্যাপ্টেন হিসাবে মনোনীত হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষকে কলেজ পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরা প্রশংসনীয় ভাবে সহায্য করেছে। এ বছরও এই হাউসে দশম শ্রেণীর ছাত্র তানভীর হাসান সহকারী কলেজ ক্যাপ্টেন, অভিভাবক দিবসের কুচ-কাওয়াজ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়তার সাথে পরিচালনা করে এক সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ হাউসের ছাত্ররা কর্মের ডাকে সাড়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না কখনও।

এই হাউসের ছেলেরা পরীক্ষায় বরাবরই ভাল ফল করে থাকে। লেখাপড়ায় এ হাউস এ বছর চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছে। শুধু লেখাপড়ার নয় লেখাধূলাতেও এ হাউসের ছাত্ররা পিছিয়ে নেই। এই হাউসের ছাত্র আবু হোসেন কয়েকবারই বছরের সেরা ক্রীড়াবিদের গৌরব অর্জন করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ অসুস্থ থাকায় এ বছর তার পক্ষে হাউসের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক

লালন শাহ্ হাউস

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এ হাউস চ্যাম্পিয়ন শীল্ড ছিনিয়ে আনে। এ বছরই আন্তঃ হাউস হকিতেও চ্যাম্পিয়ন হয়। ফুটবল ও বাস্কেটবলে এ হাউসে রানার্স-আপ হয়ে ক্রীড়া নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৬ সালে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ও দেওয়াল পত্রিকায় লালন শাহ হাউস চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য এ হাউসের ছাত্রদের নিয়মিতভাবে নামাজ আদায় করতে হয় এ ব্যাপারে সকল ছাত্র স্বতঃফূর্তভাবে আযান, কিরাত মিলাদ প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থাকে।

চলার পথে নানা সমস্যা বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে এই হাউসের প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ডের সুযোগ্য সদস্যবৃন্দ ফজরের নামাজ থেকে শুরু করে নৈশকালীন পাঠ প্রস্তুতি ও প্রদীপ নির্বাপণ পর্যন্ত হাউস পরিচালনার বিভিন্ন কাজে হাউস মাস্টার, হাউস টিউটর ও স্টুয়ার্ডকে সাহায্য করছে। ছেলেদের এই সহযোগিতার ফলেই হাউসের অন্যান্য কর্মচারীদের কাজও সহজসাধ্য হয়। সর্বপরি কলেজ কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিক সহযোগিতা, সুবিবেচনা ও তাৎক্ষণিক কর্মতৎপরতার জন্য হাউসের অনেক সমস্যাই কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। ফলে হাউসের সুনাম ও গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে।

শোক সংবাদ

এরা আজ আমাদের মাঝে আর নেই

সৈয়দ তৌহিদ হোসেন (বাবলু)

এই কলেজের ফজলুল হক হাউসের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র কলেজ নং ২৯ ৬৪ সৈয়দ তৌহিদ হোসেন (বাবুল) গত ৩১শে মার্চ, ১৯৮৭ তারিখে সন্ধ্যায় কলেজ পুকুরে পানিতে ডুবে আকস্মিক, মর্মান্তিক, অকাল মৃত্যুবরণ করে। (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন)। পরদিন সকালে কলেজ প্রশাসন ভবনে মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্য কোরানখানি ও দোয়াখায়ের অনুষ্ঠিত হয় তারপর কলেজ প্রাঙ্গণে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। কোরানখানি ও দোয়াখায়ের এবং জানাজার নামাজে কলেজের সকল ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কলেজ আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

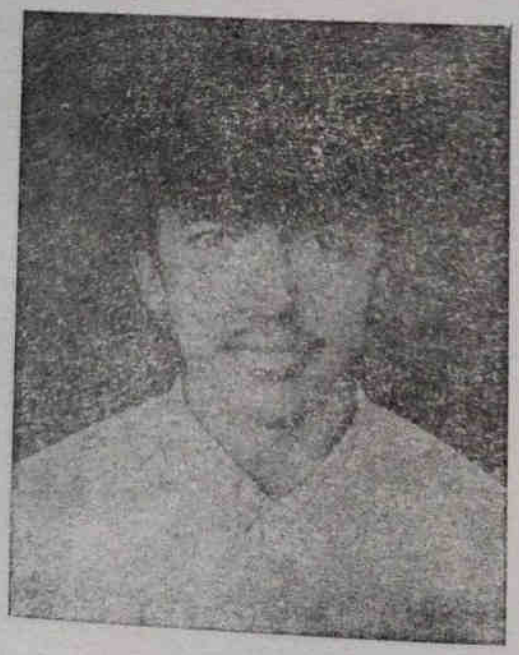

ইমরান রহমান

ঢাকা বোর্ডের ১৯৮৭ সালের এস, এস.সি. পরীক্ষায় (বিজ্ঞান শাখায়) এই কলেজ থেকে অংশ-গ্রহণকারী ইমরান রহমান গত ৩১শে মে, ১৯৮৭ তারিখে সকালে সাভারে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যুবরণ করে (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন)। পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে ৩রা জুন, ১৯৮৭ কলেজ খোলার পর পরই সকালে কলেজ প্রশাসন ভবনে মরহুমের

আত্মার মাগফেরাতের জন্য কোরানখানি ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কলেজের সকল ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে কলেজ আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মন্‌তাজ মিয়া

কলেজ দারোয়ান মন্‌তাজ মিয়া হাঁপানী রোগে দীর্ঘদিন অসুখ ভোগের পর গত ২১শে মার্চ, ১৯৮৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন)। কলেজ প্রশাসন ভবনে মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্যে কোরানখানি ও দোয়াখায়ের এবং কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত নামাজে জানাজায় সকল শিক্ষক ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালের ১লা ডিসেম্বর এই কলেজে সেকসন বেয়ারা পদে যোগদান করে পরবর্তিতে টেবিল বয়, হাউস দারোয়ান এবং সবশেষে কলেজ দারোয়ান হিসাবে দীর্ঘ ২২ বছরেরও অধিককাল ধরে সংশ্লিষ্ট সকলের সন্তুষ্টির সাথে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। কলেজ তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আখতার উদ্দীন

কলেজের ঝাড়ুদার আখতার উদ্দীন দীর্ঘদিন বহুমূত্রে রোগে অসুখ ভোগের পর গত ২০শে এপ্রিল, ১৯৮৭ তারিখে ঢাকার শের-এ-বাংলা নগরে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। কলেজ প্রশাসন ভবনে মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্যে কোরানখানি ও দোয়াখায়ের এবং কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত নামাজে জানাজায় সকল ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালের ৬ই অক্টোবর এই কলেজে ঝাড়ুদার পদে যোগদানের পর দীর্ঘ গাড়ে ২১ বছর ধরে সংশ্লিষ্ট সকলের সন্তুষ্টির সাথে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। কলেজ তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

কলেজ সংবাদ

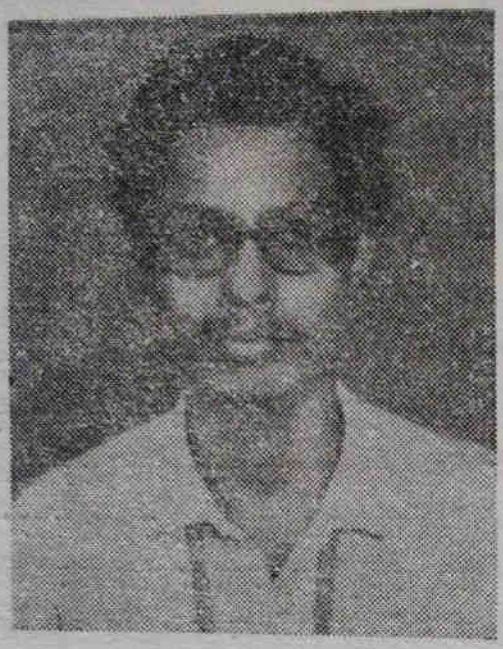

মোঃ মাসুদ পারভেজ
কলেজ নং ৩৭৭২

ঢাকা বোর্ডের ১৯৮৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় পঞ্চদশ স্থান অধিকার করে।

মোঃ আনোয়ার-উস্ সাদাত
কলেজ নং ২৭২০

ঢাকা বোর্ডের ১৯৮৭ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় সপ্তদশ স্থান অধিকার করে।

আবু হাসান চৌধুরী (ডন)

কলেজ নং ২২৮৭

দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক), ১৯৮৬-৮৭

ক্রীড়া

সাল	উদ্যোক্তা	প্রতিযোগিতার নাম বিষয়	স্থান
১। ১৯৮৩	বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশন	৪০০ মিঃ দৌড় (ঢাকা বিভীগ)	দ্বিতীয়
২। ১৯৮৩	আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মোহাম্মদপুর থানা অঞ্চল	দৌড় (১০০,২০০,৪০০ মিঃ)	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মোঃপুর জোন)
৩। ১৯৮৫	ঐ	ঐ	ঐ

৪। সে এই কলেজে ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ পর পর দু'বছর 'সেরা ক্রীড়াবিদ' হবার গৌরব অর্জন করে।

চিত্রাঙ্কন

১। ১৯৮৩	বাংলাদেশ বাটা সু কোম্পানী	চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	বিশেষ পুরস্কার
২। ১৯৮৪	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী	১৬ই ডিসেম্বর উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ১৯৮৪ : বিজয়ের জয়ধ্বনি	দ্বিতীয়
৩। ১৯৮৪	ঐ	২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ১৯৮৪ : 'একুশের চেতনা'	তৃতীয়

এ,কে,এম, হাবিবুর রহমান (হেলাল)
কলেজ নম্বর ৪২৭৫
দ্বাদশ শ্রেণী (মানবিক), ১৯৮৭-৮৮

কলেজের ১৯৮৭ সালের সেরা ক্রীড়াবিদ।

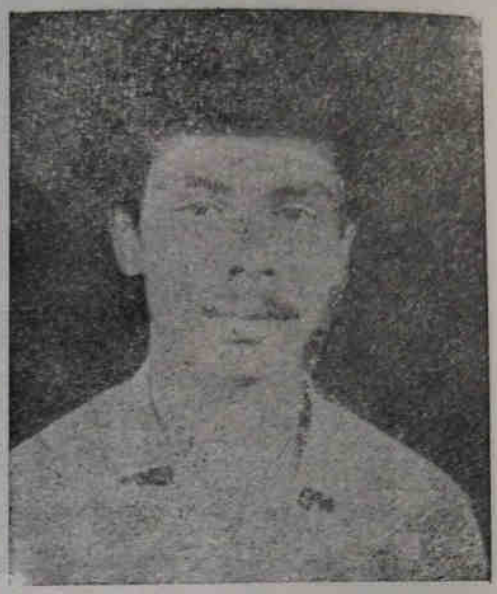

এম, এ, মুহিন (নিপু)
কলেজ নং ২২৪১
দশম শ্রেণী (বিজ্ঞান), ১৯৮৫

	সাল	উদ্যোক্তা	প্রতিযোগিতার নাম ও বিষয়	স্থান
১।	১৯৮৫	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ	রচনা প্রতিযোগিতা : ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা	প্রথম
২।	১৯৮৫	ঐ	রচনা প্রতিযোগিতা : মহানবীর রাজনৈতিক দর্শন	প্রথম
৩।	১৯৮৫	ঐ	রচনা প্রতিযোগিতা : আমার প্রিয় লেখক	দ্বিতীয়
৪।	১৯৮৫	ঐ	রচনা প্রতিযোগিতা : সীরাতুন্নবী (সঃ)-এর তাপর্য	প্রথম
৫।	১৯৮৫	ঐ	জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা : উপস্থিত বক্তৃতা	প্রথম
৬।	১৯৮৬	দশম জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ	উপস্থিত বক্তৃতা	প্রথম

৭। ১৯৮৬	দক্ষিণ এশীয় লিও ও যুব শিবির	উপস্থিত বক্তৃতা	প্রথম
৮। ১৯৮৬	জাতীয় লিও সপ্তাহ	উপস্থিত বক্তৃতা	দ্বিতীয়
৯। ১৯৮৬	ঐ	অবিরাম গল্প বলা	প্রথম
১০। ১৯৮৬	ঐ	আবৃত্তি	দ্বিতীয়
১১। ১৯৮৬	ঐ	সাধারণ জ্ঞান	তৃতীয়

মোঃ তারিক ওসমান
কলেজ নং ২৭৩৭
১০ম শ্রেণী (মানবিক), ১৯৮৬

সাল	উদ্যোক্তা	প্রতিযোগিতার নাম ও বিষয়	স্থান
১। ১৯৮৬	ইণ্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ইউনিভার্সাল পোষ্টাল ইউনিয়ন	শান্তি স্থাপনে ডাক বিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে একটি শরনার্থী শিশুর কাছে পত্র লেখা	প্রথম
২। ১৯৮৬	ভূটান ডাক প্রশাসন	সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে তৃতীয় পত্র লিখন প্রতিযোগিতা, ১৯৮৬ : আঞ্চলিক সহযোগিতা বিকাশে ডাক সার্ভিসের ভূমিকা	প্রথম
৩। ১৯৮৬	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	রচনা প্রতিযোগিতা : পোষ্টম্যান সমাজের একজন বন্ধু	প্রথম
৪। ১৯৮৬	মুক্তধারা	একুশের সাহিত্য পুরস্কার (রচনা প্রতিযোগিতা) ১৯৮৬ : আমার প্রিয় বই	তৃতীয়
৫। ১৯৮৭	মুক্তধারা	একুশের রচনা প্রতিযোগিতা, ১৯৮৭ : কেন বই পড়ি	দ্বিতীয়

গ্রিণ্ডলে'জ ব্যাংক পি. এল, সি. ঢাকা কর্তৃক প্রযোজিত এবং ব্রিটিস কাউন্সিল, ঢাকা ইন্‌স্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা ও আমেরিকান ইণ্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত "ঢাকা জুনিয়ার আর্ট এণ্ড মিউজিক ফেস্টিভ্যাল, ১৯৮৭"-তে এ কলেজের দু'জন ছাত্রের কৃতিত্ব:

রাশেদ লতিফ
কলেজ নং ৪১৫৩
২য় শ্রেণী (১৯৮৭)

(১) বাংলা আবৃত্তিতে স্বর্ণপদকসহ অনার্স সার্টিফিকেট।

(২) শিল্পকর্মে স্বর্ণপদকসহ অনার্স সার্টিফিকেট।

রায়হান লতিফ
কলেজ নং ৩৪২৮
৫ম শ্রেণী (১৯৮৭)

শিল্পকর্মে পাস সার্টিফিকেট।

অধ্যক্ষের ভাষণ

চতুর্বিংশতিতম অভিভাবক দিবস ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পঠিত

মাননীয় প্রধান অতিথি
সম্মানিত সভাপতি
শ্রদ্ধেয় অভিভাবক-অভিভাবিকাবৃন্দ ও সমবেত
সুধীমণ্ডলী।

আস্‌সালামু আলায়কুম,

বাসন্তী প্রকৃতির এই মনোরম সোনাঝরা পড়ন্ত বেলায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের চতুর্বিংশতিতম অভিভাবক দিবস ও পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এ অনুষ্ঠানে আপনাদের সহৃদয় উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করায় আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের আজকের এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে যিনি তাঁর বিরামহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে সকলকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

সুধীমণ্ডলী,

আমাদের আজকের এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ.কে, এম, নুরুল ইসলাম। প্রশাসনিক শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তিনি আজ আমাদের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর মত একজন মহান ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা একাধারে আনন্দিত ও গর্বিত।

আজকের এ অনুষ্ঠানের সভাপতি আমাদের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব গভর্নরসের চেয়ারম্যান মাননীয় শিক্ষা সচিব জনাব এম, এ, সাঈদ বিশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদের উৎসাহিত করেছেন।

সুধীবৃন্দ,

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে রয়েছে শিক্ষার চারটি স্তর—প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক। এখানে আবাসিক ছাত্ররা মোট পাঁচটি হাউসে অবস্থান করে। বড়দের শাখায় ছাত্রদের জন্য তিনটি হাউস—ফজলুল হক হাউস, নজরুল ইসলাম হাউস ও লালনশাহ হাউস এবং ছোটদের শাখার ছাত্রদের জন্য দু'টি হাউস জয়নুল আবেদীন হাউস ও কুদরত-ই-খোদা হাউস রয়েছে।

মানবজীবনে শুধুমাত্র গ্রন্থগত বিদ্যাই তার সার্বিক সহায়ক হ'তে পারে না। তাই, আমাদের এ আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রন্থগত বিদ্যার সাথে জীবনের বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ছাত্র-দেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দান করা। আর এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখানে পাঠ্যক্রম কর্মসূচীর পাশাপাশি পাঠ্যক্রম-অনুষঙ্গী কর্মসূচীও সমান্তরালভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ছাত্ররা নিয়মতান্ত্রিক ও পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রেও তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে নেই। গত দশ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের অর্জিত সাফল্যের দিকে তাকালে এ সত্য প্রমাণিত হবে (পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ')। গত বছর আমাদের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও মান-

বিক শাখায় অংশ গ্রহণকারী মোট ১২৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৮৯ জনসহ মোট ১১৭ জন উত্তীর্ণ হয়। সাফল্যের হার শতকরা ৯৫.১৬ ভাগ। ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে ৭৯টি লেটার অর্জন করে এবং ২৫ জন ছাত্র তারকা লাভ করে। ঐ একই সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় এ প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৮৫ জন ছাত্র অংশ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে প্রথম বিভাগে ৪৪ জনসহ মোট ৭০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। সাফল্যের হার শতকরা ৯৩.৩৩ ভাগ। বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত লেটারের সংখ্যা ১০১টি এবং ৪ জন ছাত্র তারকা লাভ করে। একজন পরীক্ষার্থী সম্মিলিত মেধা তালিকায় পঞ্চদশ স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে আমাদের কলেজের ২৫ জন ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভর্তি-পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করেছে এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৩০টি আসনের মধ্যে আমাদের কলেজের ৫ জন ছাত্র ভর্তি হবার সুযোগ পায়। এ ছাড়া, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে আমাদের ৩০ জন ছাত্র ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করেছে।

ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ,

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রন্থগত অধিত জ্ঞানের সাথে বাস্তব জ্ঞানের সমণ্বয় সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছাত্রদের সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পথ সুগম করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবার আমি, তাই, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের দৈহিক ও মানসিক সুসমণ্বিত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম ভিত্তিক কর্মসূচীর সমান্তরালে অনুসৃত পাঠ্যক্রম-অনুষঙ্গী কর্মসূচীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ কোন অশরীরী মানসিক স্বপ্নচারণ নয়—বরং তা' উন্মুক্ত প্রকৃতির বিস্তীর্ণ অঙ্গনে শরীরী ভ্রমণের মাধ্যমে জীবনের বাস্তব জ্ঞান আহরণের অন্যতম প্রধান সহায়। তাছাড়া, এ ভ্রমণ শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতার সীমানা ডিঙ্গিয়ে জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে চিত্তবিনোদনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা চিত্তবিনোদনমূলক জীবনোপলব্ধির সাথে সাথে পাঠ্যপুস্তক লব্ধ অধিত জ্ঞানের সাথে বাস্তব জ্ঞানের সমণ্বয়ে নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ ও পূর্ণতর করার ব্যাপারে এক শক্তিশালী অবলম্বন। এই মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে আমাদের কলেজে শিক্ষামূলক ভ্রমণের একটি সম্প্রসারিত ও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

গত বছর আমাদের কলেজের দশম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ ৫ জন সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রূপসী বাংলার প্রকৃতির লীলানিকেতন চট্টগ্রাম, কাপ্তাই, কক্সবাজার প্রভৃতি স্থানে সপ্তাহব্যাপী এক শিক্ষামূলক ভ্রমণে যেয়ে তাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ ও পূর্ণতর করার সুযোগ লাভ করে। শিক্ষামূলক ভ্রমণের এই প্রথম কর্মসূচীটি সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে আমি স্বয়ং এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। এই একই বছরে বিভিন্ন সময়ে একাদশ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ যথাক্রমে ৭ ও ৫ জন সুযোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এক দিনের সংক্ষিপ্ত শিক্ষা-সফরে বাংলাদেশের পুরাকীর্তির পীঠস্থান কুমিল্লার ময়নামতীতে যাবার সুযোগ লাভ করে। এ ছাড়া এ বছর দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ ৪ জন অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কাপ্তাই টেকনাফ প্রভৃতি স্থানে এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ একদিনের সফরে কুমিল্লার ময়নামতীতে যাবার সুযোগ লাভ করে।

একজন অনিন্দ্য সুন্দর মানুষ গড়ে তোলার পূর্ব শর্তই হচ্ছে সুঠাম দেহের সাথে সুস্থ সুন্দর মনের সু-সমণ্বয়। আমরা আমাদের ছাত্রদের সেই অনিন্দ্য সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মনন চর্চার সাথে সাথে শরীর চর্চার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছি। এজন্য প্রাতঃকালীন শরীর চর্চা ও বৈকালিক খেলাধূলা এ প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক। প্রাতঃকালীন বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শে বিভিন্ন শরীরচর্চা ও বৈকালিক পড়ন্ত বেলায় উন্মুক্ত মাঠে ফুটফল, ভলিবল, বাস্কেট বল প্রভৃতি বহিরঙ্গন খেলায় নিয়মিত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ছাত্ররা দেহ ও মনের সুস্থতা বজায় রাখার সুযোগ পায়।

শীতের সোনাঝরা এক চিত্তাকর্ষক ও মনোরম পরিবেশ এ বছর আমাদের কলেজের সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ পতিযোগিতার সমাপ্তি দিনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সম্মান-পত্র বিতরণ করেন।

মানুষের একান্ত আপন অস্তিত্বের সুকুমার ও সংবেদনশীল অংশের অপর নাম সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ তার মহত্তম ও সুন্দরতম মানবীয় গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াসী হয়। আমাদের ছাত্রদের মাঝে সেই সংস্কৃতি চেতনা উজ্জীবিত করার মহান উদ্দেশ্য প্রতি বছরের মত এবারও অমর একুশের চিরঞ্জীব আদর্শকে কেন্দ্র করে কলেজ প্রাঙ্গণের বটমূলে এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংস্কৃতি-সপ্তাহ উদ্‌যাপন এবং চারু ও কারুকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বয়স অনুসারে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে বক্তৃতা, বিতর্ক আবৃত্তি, সঙ্গীত, অভিনয়, কৌতুক, ছড়া গান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চেষ্টা করে। এ অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও সম্মান-পত্র বিতরণ করেন এ দেশের অন্যতম প্রবীণ সাংবাদিক, 'দি বাংলাদেশ অবজারভার' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক, নাট্যকার এবং বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেবী জনাব ওবায়েদউল হক।

এ কলেজের হাউস তথা ছাত্রাবাসগুলি এখানকার আবাসিক ছাত্রদের কাছে একান্তই তাদের আপন বাসগৃহের মত প্রিয়। কেননা, এখানকার প্রায় ছয়শত আবাসিক ছাত্র এক পারিবারিক অন্তরঙ্গতাপূর্ণ পরিবেশে কলেজের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ছায়াঘন শান্ত পরিবেশে অবস্থিত পাঁচটি ছাত্রাবাসে বছরে প্রায় অধিকাংশ সময় বাস করে। এখানে অবস্থানকালে তারা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করে থাকে। এক দিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি অন্যদিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, খেলাধূলা, আযান—ক্বিরাত ইত্যাদি আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তারা সর্বদা কর্মব্যস্ত ও আনন্দমুখর থাকে।

ছাত্রদের মধ্যে সুষ্ঠু নেতৃত্ব সৃষ্টি ও বিকাশের প্রয়োজনে প্রতি বছর এ কলেজের ছাত্রদের মধ্য থেকে একটি কেন্দ্রীয় প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড এবং প্রতিটি হাউসের জন্য একটি হাউস-প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড গঠন করা হয়। এই প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ডগুলি কলেজ-আয়োজিত রাষ্ট্রীয় ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মালার সুষ্ঠু আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া কলেজের দৈনন্দিন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন ও তাদের নিজস্ব বিষয়াদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

সাপ্তাহিক সমাবেশ এ কলেজের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। সপ্তাহের শেষ দিন, প্রতি বৃহস্পতিবার কলেজ প্রিফেক্টের নেতৃত্বে কলেজ বাদকদলের বাদ্যের তালে তালে কলেজের নির্ধারিত পোশাক পরিহিত সহস্রাধিক শিশু

কিশোর-তরুণের সুশৃঙ্খল ও মনোজ্ঞ কুচ্‌কাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর হাউস ভিত্তিক সারিবদ্ধ ছাত্রদের সুশৃঙ্খল সমাবেশে দেশ-বিদেশের সংবাদ ক্রীড়া জগতের সংবাদ, কলেজ সংবাদ পাঠ এবং সাপ্তাহিক আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতা সমূহের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। পরিশেষে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষের উপদেশ সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের পর জাতীয় সঙ্গীত শেষে সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

একটি সুসজ্জিত বাদকদল এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। সাপ্তাহিক সমাবেশ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অভিভাবক প্রতিযোগিতা, অভিভাবক দিবস প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠানগুলিতে বাদ্য নৈপুণ্য এ অনুষ্ঠানগুলিকে বর্ণাঢ্য ও সুষমামণ্ডিত করে তোলে। এ ছাড়াও এখানে রয়েছে একটি সুসজ্জিত রেডক্রস দল এবং বাংলাদেশ বয়স্কাউট অনুমোদিত দুটি স্কাউট দল ও দুটি কাব প্যাক।

শুধু কলেজের সীমাবদ্ধ পরিবেশই নয়-আমাদের ছাত্ররা কলেজের চার দেয়ালের বাইরেও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করে প্রভূত সাফল্য অর্জন করে থাকে।

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত বইপড়া প্রতিযোগিতায় স্কুল কর্মসূচীর অধীনে ১৯৮৬ সালে সমগ্র বাংলাদেশে মোট পঁয়ত্রিশ হাজার অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ মেধা পুরস্কার লাভ করে। এর মধ্যে আমাদের কলেজের সপ্তম শ্রেণীর তিনজন ছাত্র : কলেজ নং ১৮১৬ এ, কে, এম, বাশার ; কলেজ নং ২৮১৮ মহীবুর রহমান এবং কলেজ নং ২৮৪০ জিয়াউর রহমান এই বিশেষ মেধা পুরস্কার লাভের দুর্লভ গৌরব অর্জন করে।

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন আয়োজিত ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের দশম শ্রেণীর ছাত্র তারেক ওসমান 'অন্বেষা' বইপড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান এবং উপস্থিত বক্তৃতায় বইপড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান এবং উপস্থিত বক্তৃতায় বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান লাভের গৌরব অর্জন করে।

দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানকারী উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের জন্য আমাদের কলেজ-প্রাঙ্গণে আবাসিক ব্যবস্থা করা হয়েছিল

সুধীমণ্ডলী,

আনন্দের মধ্যে বেদনার অবতারণা বোধকরি প্রসন্নতার প্রহসন নয়। কেননা, জীবন, শুধু নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ অথবা বেদনার নয়। আমাদের সাফল্যের আনন্দ থাকলেও আমরা নিরঙ্কুশভাবে সঙ্কট ও সমস্যামুক্ত নই। তাই এবার আমি আপনাদের কাছে আমাদের কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরতে চাই।

দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ শিক্ষায়তনটি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ছাত্রদের অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারে বলে এবং পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যক্রম-অনুষঙ্গী সকল ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জনের ফলে এখানে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে উত্তরোত্তর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ১৯৬০ সালে এ প্রতিষ্ঠানটির সূচনা লগ্নে ৩৪০ জন ছাত্র নিয়ে শুরু হলেও ২৭ বছর পরে এই ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৫৮ জনে। অথচ এই সহস্রাধিক ছাত্রের মধ্যে বর্তমানে পাঁচটি হাউসে ৬০২ জন ছাত্রের জন্য আবাসিক সংস্থান থাকলেও বাকি ৪৫৬ জন ছাত্র এখনও অনাবাসিক রয়েছে। কিন্তু এটি একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধায় এখানে অনাবাসিক ছাত্রের অধ্যয়ন প্রতিষ্ঠানটির আবাসিক চরিত্রের সাথে অত্যন্ত অসঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন। অনাবাসিক

ছাত্রদের মাধ্যমে বাইরের পরিবেশের অবাঞ্ছিত ও প্রতিকূল প্রভাব ছাত্রদের মাঝে সংক্রমিত হওয়ার ফলে আবাসিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য শৃঙ্খলা রক্ষার কাজও দিন দিন দুরূহ হয়ে উঠছে। এ ছাড়া, সাপ্তাহিক সমাবেশ, ঐতিহ্যবাহী কুচ-কাওয়াজ, শ্রেণী কক্ষে বা শ্রেণী শিক্ষকের পিরি-য়ডে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়, কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, সংস্কৃতি-সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবং অভিভাবক দিবস ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এ সমস্ত অনাবাসিক ছাত্রের নৈরাশ্যজনক অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য এ অনুষ্ঠানমালার মান ক্ষুণ্ন হওয়ার ফলে শিক্ষায়তন-টির সার্বিক গুণগত মানও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অনুসৃত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন ও দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে।

এই সমস্যাবলীর আশু ও সুষ্ঠু সমাধানের প্রয়োজনে সমস্ত ছাত্রকে আবাসিক করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত এনাম কমিটির সুস্পষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা একান্তই আবশ্যক এবং এর চরিত্র রক্ষণে অপরিহার্য। এই সুপারিশকে বাস্তবায়িত করতে হলে এর সম্ভাব্য পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য শিক্ষায়তনটির শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান গবেষণাগার, ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ এবং শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদির সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

কলেজ প্রাঙ্গণে আবাসিক সংস্থানের অভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মচারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কলেজ প্রাঙ্গণের বাইরে বসবাস করতে বাধ্য হন। ফলে, একদিকে যেমন কলেজের বার্ষিক বাজেটের একটি বিরাট অংশ তাদের বাসা-ভাড়া ভাতা বাবদ ব্যয় হচ্ছে, অন্যদিকে এ প্রতিষ্ঠানটি যে কোন মুহূর্তে জরুরী প্রয়োজনে তাঁদের উপস্থিতি ও সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির এ সব আবাসিক সমস্যা-বলীর আশু সমাধানের লক্ষ্যে ছোটদের শাখায় কলেজের জয়নুল আবেদীন হাউসের দোতলায় অসম্পূর্ণ নির্মাণ কাজটি সম্পূর্ণ করা, বড়দের শাখায় তিনটি হাউসের উপর ত্রিতল নির্মাণ, শিক্ষকদের জন্য নির্মিত ত্রিতল বিশিষ্ট 'ডি' টাইপ কোয়ার্টার গুলির উপর চতুর্থতল এবং 'ই' টাইপ কোয়ার্টার-টির উপর ত্রিতল ও চতুর্থতল নির্মাণের কাজগুলো অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন। এছাড়া ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ত্রিতলবিশিষ্ট 'জি' টাইপ কোয়ার্টারগুলির উপর চতুর্থতল নির্মাণ আশু প্রয়োজন।

কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী মিলে প্রায় দেড় হাজার লোক বাস করলেও এখানে কোন কেন্দ্রীয় মসজিদ না থাকায় সমস্ত ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীকে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য কলেজ প্রাঙ্গনের বাইরে যেতে হয়। এ প্রেক্ষিতে কলেজ প্রাঙ্গণে একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ আশু প্রয়োজন।

উপরিউক্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের প্রয়োজনে যথোপযুক্ত অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত সরকারী অনুদান আবশ্যক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বিগত প্রায় সাত বছর যাবত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন খাতে কোন সরকারী অনুদান পায়নি—শুধু পৌনঃপুণিক খাতে একটি নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ পেয়ে আসছে। এ বিষয়ে আমরা সদাশয় সর-কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১৯৮৫ সালের ১লা জুন থেকে জাতীয় সংশোধিত বেতন স্কেলে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্ম-চারীদের বেতন নির্ধারণ, টাইম-স্কেল প্রদান, গ্যাস ও বিদ্যুৎ রেট বৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত কারণে কলেজের পরিচালন ব্যয়-ভার পূর্বের তুলনায় বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীলতাও আনুপাতিক

হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। (পরিশিষ্ট—'গ')। কিন্তু শুধুমাত্র সরকারী অনুদানের উপর এককভাবে নির্ভরশীল হওয়া সম্ভব নয় বলেই ছাত্রবেতন ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কেননা, এদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ব্যয়ের অনুপাতে অধিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে।

এ সব অত্যাবশ্যকীয় ও অনিবার্য সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নমূলক কাজগুলি অত্যন্ত জরুরীভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা অত্যন্ত গভীর ভাবে উপলব্ধি করছি। তা'না হলে উন্নয়ন দূরে থাক—প্রতিষ্ঠানটির গুণগতমান শুধু হ্রাস নয়—সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি মাননীয় প্রধান অতিথির সদয় ও সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলনায়তনটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও তা' এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে।

সকল শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য কর্মচারীর একনিষ্ঠ আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়নতা ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে আজকের এ অনুষ্ঠানটির সকল আয়োজন সুষ্ঠু সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ অনন্যসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

সমবেত সুধীমণ্ডলী,

আপনাদের বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আজকের এ অনুষ্ঠানটিকে সফল ও সুন্দর করে তোলার জন্য আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার বিশ্বাস আমাদের সরলপ্রাণ কোমলমতি শিশু-কিশোর-তরুণদের আয়োজিত আজকের এ অনুষ্ঠানের সকল সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনারা সস্নেহে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

মাননীয় প্রধান অতিথি,

আপনার বিরামহীন কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের আজকের এ অনুষ্ঠানে আপনার সহৃদয় উপস্থিতিতে আমরা সকলেই অত্যন্ত উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মূল্যবান উপদেশবাণী আমাদের ছাত্রদের চরিত্রগঠনে ও তাদের নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখবে এবং আমাদের কর্মের পথে অনুপ্রাণিত করবে। পরিশেষে, আমি আপনাকে ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে আর একবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

গিয়াসউদ্দিন হায়দার চৌধুরী
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। (পরিশিষ্ট—'গ')। কিন্তু শুধুমাত্র সরকারী অনুদানের উপর এককভাবে নির্ভরশীল হওয়া সম্ভব নয় বলেই ছাত্রবেতন ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কেননা, এদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ব্যয়ের অনুপাতে অধিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে।

এ সব অত্যাবশ্যকীয় ও অনিবার্য সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নমূলক কাজগুলি অত্যন্ত জরুরীভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা অত্যন্ত গভীর ভাবে উপলব্ধি করছি। তা'না হলে উন্নয়ন দূরে থাক—প্রতিষ্ঠানটির গুণগতমান শুধু হ্রাস নয়—সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি মাননীয় প্রধান অতিথির সদয় ও সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলনায়তনটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও তা' এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের অপেক্ষায় রয়েছে।

সকল শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য কর্মচারীর একনিষ্ঠ আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়নতা ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে আজকের এ অনুষ্ঠানটির সকল আয়োজন সুষ্ঠু সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ অনন্যসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

সমবেত সুধীমণ্ডলী,

আপনাদের বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আজকের এ অনুষ্ঠানটিকে সফল ও সুন্দর করে তোলার জন্য আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার বিশ্বাস আমাদের সরলপ্রাণ কোমলমতি শিশু-কিশোর-তরুণদের আয়োজিত আজকের এ অনুষ্ঠানের সকল সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনারা সস্নেহে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

মাননীয় প্রধান অতিথি,

আপনার বিরামহীন কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের আজকের এ অনুষ্ঠানে আপনার সহৃদয় উপস্থিতিতে আমরা সকলেই অত্যন্ত উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মূল্যবান উপদেশবাণী আমাদের ছাত্রদের চরিত্রগঠনে ও তাদের নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখবে এবং আমাদের কর্মের পথে অনুপ্রাণিত করবে। পরিশেষে, আমি আপনাকে ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে আর একবার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

গিয়াসউদ্দিন হায়দার চৌধুরী
অধ্যক্ষ
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

পরিশিষ্ট 'ক'

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা—৭
ঢাকা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষাসমূহের ফলাফল

সন	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা			উত্তীর্ণের শতকরা হার	লেটারের সংখ্যা	মেধা তালিকায় প্রাপ্ত স্থান
		প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ			
১৯৭৭	৪৮	১৬	২৫	৪	৯৩.৭৫	৪৯	প্রথম (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৭৮	৪৭	২৬	১৪	৭	১০০	৫৭	—
১৯৭৯	৫৩	২৪	২৩	৪	৯৬.২৩	৭১	ত্রয়োদশ (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)
১৯৮০	৪৯	২৪	২৩	২	১০০	৭১	—
১৯৮১	৬০	২৭	১৫	৮	৮৩.৩৩	৫১	পঞ্চম (সম্মিলিত মেধা তালিকায়), নবম মানবিক শাখায়
১৯৮২	৪৯	১৮	২৩	৪	৯১.৮৪	৬৯	উনবিংশতিতম (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)।
১৯৮৩	৫৫	৩০	১৩	১০	৯৯.৩৬	৯৫	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৮শ ও ১৯শ।
১৯৮৪	৭৫	৪৫	২৮	২	১০০	১৩৮	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১০ম
১৯৮৫	৬৭	৪৫	২১	—	৯৯	১২২	—
১৯৮৬	৭৫	৪৪	২৬	—	৯৩.৩৩	১০১	সম্মিলিত মেধা তালিকায় পঞ্চদশ

পরিশিষ্ট 'খ'

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ,,ঢাকা—৭

ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষাসমূহের ফলাফল

সন	মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণের সংখ্যা			উত্তীর্ণের শতকরা হার	লেটারের সংখ্যা	মেধা তালিকায় প্রাপ্ত স্থান
		প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়			
১৯৭৭	৩৭	২৭	৯	১	১০০	১৮	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ষষ্ঠ, সপ্তম, ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ স্থান এবং মানবিক শাখার ষষ্ঠ স্থান
১৯৭৮	৩৭	৩০	৪	২	৯৭	—	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪র্থ ও নবম।
১৯৭৯	৪৮	৩৯	৯	—	১০০	৪২	সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ, ও দ্বাদশ এবং মানবিক শাখায় তৃতীয়।
১৯৮০	৫৯	৪৪	১৪	১	১০০	৬০	সম্মিলিত মেধা তালকায় ১ম, ৫ম, ৭ম ও ১৭শ, মানবিক শাখায় ৮ম।
১৯৮১	৪৯	৪০	৮	১	১০০	৩১	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪র্থ, ১১শ ও ১৬শ মানবিক শাখায় ষষ্ঠ।
১৯৮২	৫০	৩৮	১৯	৩	৯৩.৭৫	৪৬	প্রথম (সম্মিলিত মেধা তালিকায়)। নবম মানবিক শাখায়।
১৯৮৩	৬১	৪৮	৯	১	৯৫.০৮	৭২	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য়, ৭ম, ১৩শ, ১৬শ। ১০ম (মানবিক শাখায়)।
১৯৮৪	১২৪	৮৩	৩৬	—	৯৬	৯৮	৪র্থ, ১২শ ও ১৪শ।
১৯৮৫	১১৪	৭৯	৩৪	—	৯৯	১৩১	
১৯৮৬	১২৪	৮৯	২৮	—	৯৫.১৬	৭৯	

পরিশিষ্ট 'গ'

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা—৭
(দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি খাতে ব্যয়ের বিবরণ)

ব্যয়ের খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬
বিদ্যুৎ ও বাল্ব	২,২২,০৫০	৩,৯০,৮৬৬	৬,১০,৭৭০	১২,২৩,১৬৮ (বকেয়াসহ)	৬,৮০,৫৮৯	৯,০৩,১১৫
টেলিফোন	১০,৩৭৬	১২,৪৪০	১৪,৯৪৮	১৭,৬৫২	২২,৭৭৭	৩৬,৮৬০
বাস রক্ষণা-বেক্ষণ ও পেট্রোল	২,০৬,৯২৩	১,৮৬,১৩৮	১,৮৬,৬২১	১,১১,২৮০	১,৬৭,৯৬৩	২,২২,০৪৭
পৌর কর	৭৩,৩৫৬	৭৩,৩৫৬	৭৩,৩৫৬	৭৩,৩৫৬	৭৩,৩৫৬	৭৩,৩৫৬
খাদ্যসামগ্রী	১৯,৪৮,১৪৬	২১,৯৩,৪৪৪	২২,২২,১০৭	২৬,২২,১০৭	২৭,৫২,৫৭৮	৩০,৭৮,৬২০
শিক্ষক ও কর্মচারীদের ও ভাতা বেতন	১৫,৪৪,৯৭২	১৭,২৮,৪৮৫	২২,৫৭,৯৬০	২৪,৬২,১৮৮	৩১,৫৪,০৭২	৩৭,১৬,৮৩৩
মোট :	৪০,০৫,৬৫৩	৪৫,৮৪,৫২৯	৫৩,৭১,৯৩৫	৬৬,০৯,৭৫১	৬৮,৫১,৩৩৫	৮০,৩০,৮৩১

ENGLISH SECTION

BURMA : A Land of Pagodas

Naved Ahmed
College No. 4110
Class-XII Sc

Halved by mighty Irrawaddy river, Burma is six times larger than Bangladesh. Snow capped Khakaborazi, Burma's highest peak in the extreme north towers 19,296 feet. But the main attraction is river Irrawaddy which flows from glaciers in the northern Border of Burma and is called "The country's main street". Rangoon is the capital of Burma. With a population of just over three million it is one of the greenest city in Asia. The world's largest Pagoda "The Shwedagon Pagoda" is in Rangoon. With its stone-caped gold dome it is a fascinating site to see specially from the Inya Lake. If you walk through Rangoon in a sunny day you will see beautiful short Burmese girls wearing "Loungis", small children playing "Chillo"-a traditional Burmese game. People are seen eating "Kho Naya"-a kind of Burmese noodles made with coconut milk. The streets are narrow and the main market starts from early morning.

There are innumerable pagodas scattered all over the country (in Burma) following a time honoured custom of building pagodas as shrines to the memory of Buddha. Pagan a city with just 2500 people have over 5000 pagodas ! This city offering a perspective stupas still remains the spiritual heart of Burma.

Other famous ones are "Kyaiktiyo Pagoda" built on top of a percipice and Mewtin pagoda built on the rocks jutting out to seet. Moreover in the Shan state there are caves inside which there are myraid of stone images of Buddha, built in stalactites. Cliff-side Buddha shrines carved during the era of Pagan kings loom 300 feet above Gautama hills.

Burmese culture is reflected by the country's architecture. They are master in wood carving. Now let us come to some Burma's fascinating and colourful festivals which are all observed in accordance with the full moon.

In March the festival commemorating the anniversary of the enshirinement of the eight hair relics of Gautam Buddha is observed.

Small Pagodas are built with sand on silvery dry river bed. Fragarant flowers sprout and shed their sweetness giving it a feeling of idyllic romance. The magistic full moon looms up as piligrims pass the night with religious devotion. The most enjoyable festival of all is "Thingyan Festival" in Mid-April. It is called the "Water festival". The Burmese get drenched and sing merrily to usher in the Burmese New-year. Astonishing, the Burmese still worship spirits.

With a rich heritage ancient civilization, beautiful forests, emerald-blue lake, marry-making festival and a beaming people Burma is one of the most beautiful country in Asia.

Islam and Modern man--An Anatomy

Abu Zayed Mohammad
College No. 215
Class XII (H)

Religeon has its meanings and purposes. But religeous exertions represent a quest for the rediscovry of man--the modern man. For he is threatened by a world created by himself. He is faced with the dire problem of retrival of the mind from naturalism, secularism and above all an opposition to a belief in the Omnipotent. The modern man is blined by a lighting from his own torch. A veil of secrecy hangs over the horizon of his beliefs and calculated path of actions. Confronted with the question of meaning; he is summouned to rediscover and scrutinze the immutable and the permanent which constitute the aspects of life. Through this narration I have tried to settle a link between the lives of modern man with a religeon that should be the precise guiding path of life. Man's rediscovery of a calculated path is the workout of religeon--Islam.

The brief exposition of the principles and teachings of Islam is based upon the Quran—the scripture of Islam. Except when otherwise indicated, all references are to the Quran. For those who question the validity of it and its practical aspects—the answer is :—

When Mohammad (Sm.) the shining example of the proper practical value of the Quran was in the peak of his prophecy; the civilisations associated with the names of Egypt, Babylon and Greece were already matters of history. Thus it concluded the particularity of Islam as the path for the modern man as well as the man to come.

We can divide a man's life into two different spheres. One is his life of privacy or private; while the other is his public life. Public life covers his relationship with other humans and beings. The private life consists of man's belief about the concept of Allah, his creations, life after death and workouts such as five times paryer a day' fasting during the entire month of Ramadan, pilgrimage to the holy places of Mecca and Medina for the able etc. The concept for all these subjects is related to moral and spiritual values that are the foundation for a stable man. Social values, economic aspects, public

affairs and most recentlty with the widening world international relations covers man's public life. Encyclopedia— one upon another can be devised while writing on these topics. But the objective of this writing is not the basic and essential succes but the role of Islam as it is required for the man who is faced with a difficult proposition.

Mankind has definitely entered upon a new era. It's outstanding ability is the rapid forward march of civilisation. Man's knowledge and mastery over the forces of nature is expanding fast. The prospect ahead is not devoid of fear and dread with eager hope is also carries innumerable evils. These evils or fears results from the doubt about the application of vast knowledge to which mankind is becoming heir every now and then.

Man is given a free choice about these matters on how knowledge and power be utilized or used. This is the purpose of religeon to provide the guidelines so that man has a good application for God's bounties.

The true remedy, therefore, the ills that effect mankind today and that threatens to overwhelm it tomorrow is for man to turn to Allah with the single minded purpose of finding his peace in Him. Having sincerely determined that in all matters whatsoever his gudiing rule shall be : "Thy will and not mine." Truly mankind stands again on the brink of a pit of fire God's grace and mercy alone can save it. To win his grace and mercy we must turn to Him and only Him. If we seek protection from all kinds of displacements then we must turn and go by Him and His associated objectives. There is no other way.

The role of Islam in the present day may be summerized as follows : it inspired faith in, and realisation of the existence Beneficent creator, without partner, associate or equal, who is the sole source and fountain of all beneficence and who has created the universe and all that is in it with a purpose. The purpose : Man shall become and image of God, a reflection of divine attributes and be guided by his light. To that end man has been appointed God's representative upon earth ; and the universe has been directed to service. The "laws" ruling the universe all operate toward the full-filllment of that divine purpose—Islam.

In short Islam sets forth and places at man's disposal a most effective and potent means of achieving the purpose of life. Of God's numberless bounties given to man it is one of the greatest and most precious . It is his torch in a darkened world. It is Islam—The Religeon.

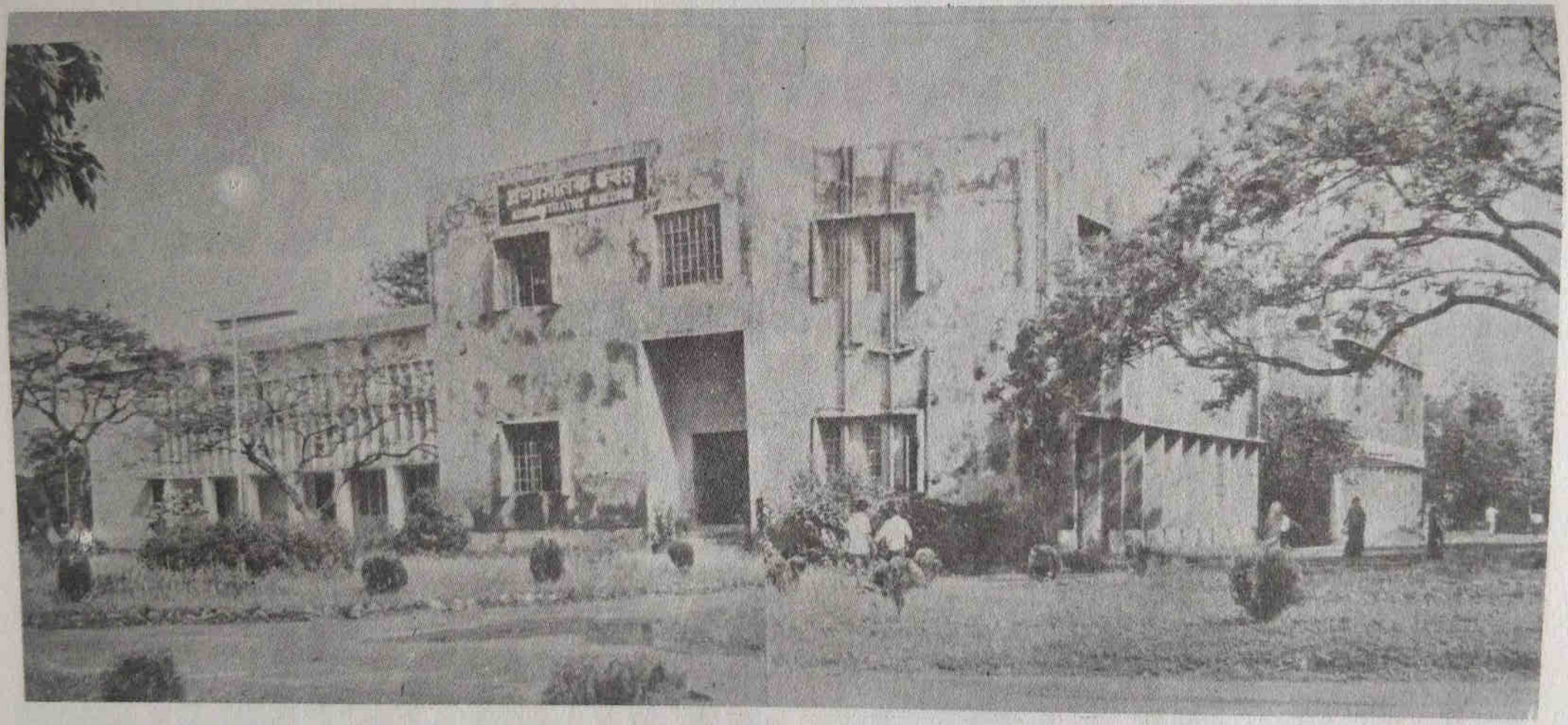

প্রশাসন ভবন

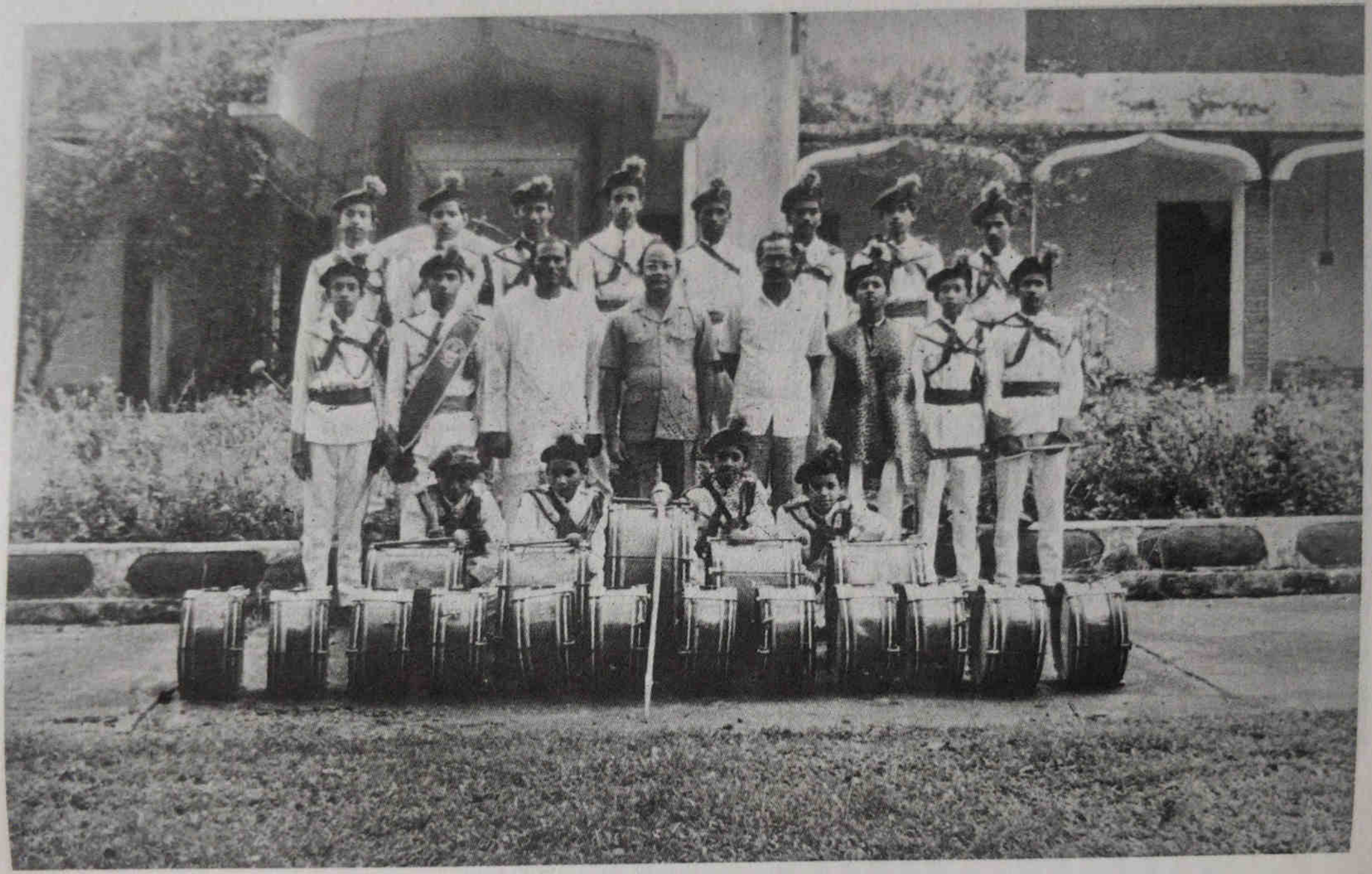

কলেজ ব্যান্ড

As You Like It

A. B. M. Shahidul Islam
Lecturer
Department of English

Don't we need to be fitted up with power that can help us face life with all its oddities and attractions ? Don't we want to be elegant, eloquent, forceful and effectve in our manners and expressions ? Yes, knowingly or unknowingly we, do. And then a simple and relevant question follows—how ? Through natural abilities alone ?

No, "for natural abilities are like natural plants, that need proyning by study". Here lies my point. Why don't we pay heed to reading, especially, the reading of literature where we all have easy access ? Literature, and literature alone, can impart much of the power we need to be a full and fine man.

In "Ulysses", Lord Tennyson says : "I will drink life to the lees."—Isn't it an expresion excellently effective in form and deeper in meaning ? Again, when he says : "How dull it is to pause, to make and end, To rust unburnished not to shrine use"—we have another example of an expression which to immaculately poetic in form an deeply charged with meanings. From literature we can amass hundreds of thousands of examples like these. More reading of great works of literature give us aesthetic pleasures and probing deep into them gives us knowledge. This is how, unlike other branches of knowledge. literature teaches and educates most gracefully and effeciently. Literature has this power as it is—"the thought of thinking souls,"—"an analysis of experience and a synthesis of the findings into a unity.

A question, again, won't be irrelvent in this connection. Is everything worth reading and should we read all and read to accept readily ? I suggest—no. We cannot rule out the good effect of indiscriminate reading. But it is better to be judiciously selective, And when acceptance is concerned, much more deliberations are needed. In short, we must learn to weigh and consider before we accept.

To avoid risk of wastage of time we can go to the great writers—the writers whose writings have survived the burning

tests of time and age. Great writers always get us acquainted with views and ideas remote and unfamiliar ; with situations feelings and emotions intricate and inexplicable ; with mystries and profoundities of life and the universe sublime and unintelligible to us. In fact, to broaden our outlook, to enhance our understanding of life, to teach us to look into and interprete life in its right perspective—is their holy duty. They are gifted with much more comprehensive, versatile, penetrating, imaginative and sensitive a mind than ours—the ordinary people. So, to come in contact with their works is to come in contact with those souls that seek to communicate (not the vain power of the Bosses nor the power that riches have.) This enlightening power can benifit a man to as much an extent as he is able to receive it. To my conviction, a man properly induced with the power that literature emits can not but learn – how to love and be loved ; how to be eloquent and elegant and above all how to be a full and fine man.

A fine man, frankly to speak, is never a docile crefure. The man who for the sake of so called modesty and gentility, or purpose fully, does swallow poisons he himself does not like—may be 'a docile gentleman, but never a real gentleman, and ofcourse not a fire man. A gentleman must be elegant in his manners, spirited in his deeds and conscientious in his dealings. Therefore, to be eloquent is to be brave, not to be docile ; to be elegant is to be nice, not to be vulgar or repelling and to be effective is to be spirited, not to be audacious. And to be all these is to be a good man and that s all. The power that literature imparts wants to create a conscientious man.

So—what gets spoiled if we have a prolonged bath in the ocean of literature of invaluable riches !

The Quarter century of Dhaka Residential Model College

Sk. Md. Omar Ali
Associate Professor

Here I have spent the best part of my life with much pleasure and excitement. I still feel like coming over here over and over again"—said one of the Remians in an ecstasy of delight on the occasion of reunion of ex-students that took place in 1987. REIMA N is the short name for the alumni of DHAKA RESIDENTIAL MODEL COLLEGE originally named as Dhaka Residential Model School.

More than a quarter century has elapsed since the college was set up in 1960 after the Pattern of public schools in the U. K. and under the direct control of the then Government of Pakistan. The 6th May, 1960 is a red-letter day in annals of the college as on this day the inauguration of the college was performed by Mr. Habibur Rahman, the than Minister of Education. It was raised to the Higher Secondary level in 1967 and the inauguration was performed by Mr. Qazi Anwarul Haque, the then Central Education Minister.

In 1962 the than Central Government handed over the college to the then Provincial Government which only after three years in 1965 placed it under the management and control of an Autonomous Board of Governors. But when the question of disparity deminasted the political arena, then Gover nment of Pakistan came forward to take it over in 1966, though its status remained unchanged. Finally the Government of the People's Republic of Bangladesh reconstituted the Board of Governors headed by the Secretary, Mninistry of Education, in 1973 in order to manage its affairs.

Distinguished Personalities like Lt. General Khawaja Wasiuddin, Mr. Ali Asgar Khan, Chief Secretary, the than Government of East Pakistan, Dr. M. O. Gani, Vice-Chanceller, Dhaka University, and the Secretaryis of the Ministary of Education of the then Government of Pakistan chaired the meetings of the Board of Governors in the Pre-Bangladesh period. The illustrious sons of independent Bangladesh like Mr. Muqammel Haque, Mr. Mujibul

Hoque, Mr. Qazi Fazlur Rahman, Mr. Qazi Jalauddin Ahmed, and Mr. Qazi Azher Ali, not only discharged their duties as Secretary, Ministry of Education but also presided over the meetings of the most powerful Board of Governors and served as a beacon-light to the college. The present Board of Governors consists of the following :

1. Secretary
   Ministry of Education,
   Government of the People's Republic of Bangladesh,
   (Mr. M. A. Syed)
   Chairman (Ex-officio)
2. Vice-Chancellor
   Dhaka University.
   Member (Ex-officio)
3. Director General
   Secondary and Higher Edu.
   (Dr. A.H.M. Karim)
   Member (Ex-officio)
4. Chairman,
   Board of Intermediate and Secondary Education, Dhaka.
   (Mr. A. R. Choudhury)
   Member (Ex-officio)
5. Joint Secretary,
   Finance Division,
   Ministry of Finance and Planning,
   (Mr. A. B. Choudhury)
   Member (Ex-officio)
6. Mr. Md. Shamsul Haque Chisty
   Secretary,
   Ministry of Establishment.
   (Government Nominee interested in Education)
   Member (Govt. Nominee)
7. Dr. G. M. Shahiduddin Ahmed
   Associate Professor,
   Dhaka Medical College
   (Guardians Representative)
   Member
8. Mr. Eaqub Khan
   Superintending Engineer
   (RHD)
   (Guardians Representative)
   Member
9. Mr. Sk. Md. Omar Ali
   Associate Professor
   Dhaka Residential Model College
   (Teachers Representative)
   Member
10. Principal,
    Dhaka Residential Model College,
    (Mr. Ghiasuddin Haider Chou.)
    Member-Secretary
    (Ex-officio)

Mr. M. A. Syed, the present Chairman of the Board of Governors is an integrated personality. Naturally, it is expected that under his enlightened guidance and inspiring leadership the college is sure to make a great stride in its onward march of progress.

Seven distinguished principals—Col. M. M. Rahman, Lt. Col. Shafi, Mr. Q. N. Haque, Mr. Azizur Rahman, Col. Ziauddin Ahmed, Mr. Mohammad Noman, and Mr. Lutful Haider Choudhury entered upon office in succession. Each of these great educators made his mark and left a glorious heritage to his successor. Mr.

Ghiasuddin Haider Choudhury, the present Principal of the college, is at once an experienced teacher and an able administrator. Being a man of indomitable will and firm determination, he bids fair to be crowned with brilliant success in his mission.

The College occupying an area of about 52 acres of land in the heart of the capital city imparts instruction in the first three stages of education—primary, secondary and higher secondary. It is the only institution in Bangladesh that provides residential accommodation for 600 students out of 1100, 34 teachers out of 57 and 37 other employees out of 149. It is the only institution that admits a child of 5 years as a resident student and brings it up for long 12 years. This is why no other educational institution bears favourable comparison with the college. It is really unique in itself. Parents consider themselves most fortunate when their dear and near one enters the vast college campus, sometimes with tear rolling down the cheeks. How painful it is to see worries and anxieties staring the same parents in the face when their promising young son comes out of the boundary walls, even though with a brilliant academic record ! Reasons are not far to seek.

The college has sprung up into existence with the noble object of training the character and personality of students in such a way that they may realize their potentialities to fullness and assume leadership illumining all walks of life, such as country's defence, civil administration, industry, trade and commerce, education, culture and literature, medicine and technology.

With these noble aims and objectives in view, the college has introduced a wide and varied range of occupations and interests, both curricular and co-curricular. Even a cursory look at the daily schedule of events bears testimony to the fact that resident students lead a very busy but interesting routine-bound life. Apart from the compulsory attendance at the class room instruction imparted from 0745 hours to 1300 hours and supervised night study of about three hours duration, they get up very early in the morning sometimes even before the crow stirs and take physical jerks before breakfast. Again after lunch they take part in activities like religious education, band party consisting of 26 well-dressed Lilliputians, arts and crafts, scouting and cubbing, in-door games, music, literary club and the like in accordance with their tastes, appitudes and interests. They also compulsorily participate in outdoor games like football, cricket,

hockey, volley-ball, basketball etc. under the supervision of four experienced trained teachers. In the twinkling of an eye 18 playgrounds assume a festive look just because the jubilant giants of age group between 5 and 18 rush out of the House-gates like shooting stars.' 'The battle of Waterloo was won on the play grounds of Eton "--there goes the famous saying. The playgrounds of the college are expected to play the same role as those of Eton.

The weekly assembly usually held on Thursdays deserves a special mention in that it is looked upon as a barometer of the tone and tradition of the college. As soon as the students fall in House-wise in horse-shoe formation the assembly begins with the recitation from the holy Quran followed by Bangla version. Led by the College Captain, they smartly salute the national flag flaunting in the breeze and march off keeping pace with the drums beating rhythmically and rending the morning air. After three boys have read news of special importance, all the students hear with breath held back the college elder announcing the nerve-breaking results of inter-class and inter-House competitions held enthusiastically during the week. Finally, the Principal in his address throws some light on important events, advises the students to live upto the tone and tradition of the college and draws attention of all to 'espirit de corps'. The assembly breaks up as soon as the national anthem stops ringing in the ears of all present.

The college believes in utility of self-government among pupils and has introduced the House system which is considered the best form of popils self-government. The college can really boast of five self-contained Houses named after the most celebrated son of the country Qudrat-e-Khuda, Zainul Abedin, A. K. Fazlul Haque, Qazi Nazrul Islam and Lalon Shah. The first two Houses are meant for the sweet little darlings of age group between 5 and 12 and the rest for the adolescent and young ones. The prefectorial system characteristic of a public school plays a vital role not only in the House administration but also in the social life of the whole college. The Prefects are given freedom to manage their affairs, organize socio-cultural religious and state functions, maintain discipline, receive dignitaries and visitors, and to deal with minor disciplinary cases. Thus the pupile self-government developments leadership qualities and inculcates a spirit of service above self in the pupils. In short, it is a laboratory for training in the practical art of democratic citizenship, indeed.

The fantastically decorated stage under the banyan-tree catches the fancy of all as the Cultural Week commences in a befitting manner on the eve of the Shaheed Day. The highlights of the week events are discussions on the significance and importance of the Shaheed Day in national life, set speech, debating, songs of all kinds, one-act plays, drawing, art and craft exhibition, mimics, caricature and the like. Every day from dawn to dusk, parents, to their delight, see their sons competing in diverse events. They are beside themselves with joy when they watch their dear and near onces coming off with flying colours. The long cherished week-long programe is chalked out primarily to pay heart-felt homage to the departed souls of the martyrs to infuse a high sense of patriotism among the students.

The students are occasionally brought in close contact with the larger and greater social life throbbing and pulsating outside the boundary walls of the college with a view to widening the horizon of the intellectual world they live in. The go on excursions of educative value to the places of historical importance. They also go round mills, factories, industries and different laboratories. Thus they get correct information about the condition of work in industries and accurate knowledge of occupational opportunities and actual requirements in the country.

In all probablity, nowhere in Bangladesh do so many pupils, parents and patrons look forwards to attending a function like Parents Day and Annual Prize Distribution Ceremony with so much enthusiam as the three P's of Dhaka Residential Model College usually do every year. Both in formality and grandeur this function overshadows all others.

The college magazine SANDIPAN acts as a great incentive to literary efforts. "The pupils who have ideas to express and the desire to share them with others, find in it a powerful medium of communication. "From now on no pains will be spared to bring it out annually.

It is admitted on all hands that no educational institution is worth the name which does not postulate the existence of a library acting as the hub of the academic and intellectual life of the students. Our is the one that can really boast of a very rich library having a collection of about twelve thousand books on various subjects and besides it subscribes to a number of dailies and joutrnals both national and international, which widen the intellectual horizon of our students.

There was a time, and not so long ago either, when some fastious critics branded the college as a "breeding centre of an aristocratic class, undemocratic ideas and class mentality. Indeed, an educational institution, being an intergral part of national life, should not cherish and nurse customs and traditions, ideas and ideals quite different from those the nation expects schools and colleges to foster and promote. And this college, to put emphatically does not encourage, anything incompatible with national life.

In other wards, the well organized co-curricular activies like J. R. C. (Junior Red Cross), scouting, cubbing colourful weekly assembly, important religious and cultural functions reflect the desired aspirations of the nation. Furthermore, the college, being basically residential in character occupies a unique position to cultivate conciousness among its pupils, aiming at the larger welfare of the nations. When a new pupil enters the college, he willingly submits to its social life without sacrificing his right to develop his individual personality. Its pupils are drawn from homes of different backgrounds following diverse religious customs and creeds. The live harmoniously for years together under the same roof, spending ther most impressionable and pliable stage of life, having common hopes and aspirations and making friendship of life-long duration. This training of peacful living a small community of the college campus consisting of five houses definitely goes a long way to enable them to lead a well adjusted life as balanced personalities in the larger community, be it native or alien.

In fact, the campus life teaches resident students how to sink undersirable differences, shake off regional affiliations and forge a spirit of national unity out of apparent divergencis.

It is gratifying to note that the students educated here have started proving their mettle in various walks of life. More so it is when we recall that the college turned as if by magic into a nursery of heroes who responded spontaneously to the clarion call of liberation struggle that broke out in 1971. The heroic death of three students-Nizamuddin Azad, Taufique Hossain and Salimur Rahman who set up an unprecedented example of sublim heroism and selfsacrifice, while defending their beloved motherland against the overwhelming majority of experienced enemy forces in 1971, evokes even today and will evoke in future an all time to come admiratiomn in the hearts of all Bangladesh who

have got the slightest sence of patriotism. The suprema sacrifice these unforgettable martyrs had made by laying down their lives before they were in the bloom of youth, will shine like the morning star in the sky and will never fall into oblivion in all days to come.

The undaunted valour that Major (Retired) Shamsher M. Choudhury B. B. displayed in the war of independence, is still a living force as well as great inispiration to one who like to carve out a career for oneself as a really great soldier of the countrv. Another Remian, Habibul Alam B. P. has gone down in the annals of Bangladesh as a legendary hero for his inestimable courage and incomparble organizing capacity and dexterity. In this context we cannot but call to mind the names of a teacher, Shaheed M. A. Rahim and three other employes--Shaheed Jalaluddin, Shaheed Nasiruddin and Shaheed Mustafa, who were killed in the liberation war, lest we should forget them. To sum up, these brave sons of Bangladesh have enable the college to occupy a glorious place in the history of ours.

In addition to Bengali, English and Matehmatics, subjects like arts, crafts and music are compulserlly taught in classes from I to VIII in ordar to enablo the students to make the best use of their creative talents and to develop aesthetic sence gradually. Every year on the eve of the Shaheed Day an art and craft exhibition is held. Most of the students of all classes divided into four groups take part in the exhibition which is traditionally opened by a distinguished personality and visited by most parents. Pictures, drawings, sketches, handicrafts, wall magazines and the like conspicuously exhibit the real creative talents and wonderful craftsmanship of the participants and draw applause all those who go round the exhibition. It is appropriate to mention that our boys have participated in national and international competitions. Nasrul Hamid and Qamrul Islam gained silver medals in Shankar's International Childrens Competition.

The college won championship in hockey in 1968 and gained laurels in Inter-School Nirman Cricket in 1983. The Remian Aftab Molla not only achieved the glory of being the fastest youth and man in Bangladesh but also brought a good deal of reputation for the country by doing well in track events abroad. Remians Khawaja Rahmatullan and G. S. Hassan made their mark in hockey and cricket rospectivoly and received national colour. Nevertheless, our boys are chary of participating in inter-school competitions for

some reasons, particularly for malpractice in the selection of participants by a very few institutions, lack of security in playground and above all, their pre-occupation with manifold internal activities. Moreover, the organization of all games aims at providing pleasure, building up health and cultivating fine qualities of character like discipline, self-reliance, co-operation, and team spirit ; no provision is made for specilization in any game. As a result, our boys look like "Jack of all trades, master of none".

Even if academic performance is looked upon as an indicator of achievements, undoubtedly, the college can really boast of it. Of all the students it has produced so far, the most brilliant ones are Mohammad Ali Faisal, Golam Samdani and Sultan Ahmed who stood first in the H. S. C. Examination in 1974 -1979 and 1980 respectively. Qamrul Islam really deserves a special mention, as he studied here for long 12 years and topped the combined merit list of the S. S. C. Examination in 1977. In the H. S. C. Examination held in 1979 he stood second to none except one and that is our Golam Samdani who had the honour of shattering the record of highest marks obtained so far. The following table showing the positions secured by our students in the S. S. C and H. S. C. Examinations, stand out brilliantly :

S. S. C. Examination

Year	Position secured
1966	4th
1968	13th
1972	11th
1973	5th 6th, 7th
1974	10th, 15th, 8th (Hu)
1977	Ist.
1979	13th
1982	5th, 19th, 9th (Hu)
1983	18th, 19th
1984	10th.
1985	15th

H. S. C. Examination

Year	Position secured
1974	Ist, 9th
1975	3rd.
1977	6th, 7th, 13th, 18th, 6th (HU)
1978	4th, 9th.
1978	Ist, 2nd 11th, 12th, 12th, 3rd (Hu)
1980	Ist, 5th, 7th, 17th, 8th (Hu)
1981	4th, 11th, 16th.
1982	9th
1983	3rd, 7th, 13th, 16th, 10th (Hu)
19 4	4th, 12th, 12th, 14th.

The positions secured in the merit list of the S. S. C. and H. S. C. Examinations, it is ture are not too many, but the average performance in the said examination is amazingly admirable. For example, 77 students sat for the H. S. C. Examination in 1986 in Science Group. 68 were placed in the Ist. division. Of them 25 got oppertunity for admission into Engineering University, 5 into Computer Engineering and 30 into different medical colleges. Suffice it to say, the college has practically toppled the academic record set up by premier institutions of the country in so short a span of time.

The achievements of the college in literary activities, particularly in essay-writing competitions, are no less significant than those in public examinations. Never before in the annals of the college did a student of secondary level make such a glorious record of winning six first prizes for his brilliant success in essay-writing competition organized by various agencies like Bangladesh Insurance Academy, Bangladesh Postal Department, Bangladesh Bird Conservation Society, Bangladesh Red Cros Society, etc. as Baizid Khurshid Riaz did. He is the record that can be shattered by a versatile genius only. A. K. M. Salok is another talented boy who stood second to none in essay-writing competitions organized by Bangladesh Shisu Academy, High Court Mazar Committee. etc. Tareque Osman of class X (Hu) is a fine acquisition to the college. It is he who had the honour of securing the top position in letter-writing competition organized by the Postal Department on the occasion of the SAARC Conference held in Dhaka.

The trend among the Remians of carving out careers for themselves clearly indicates that most of them take up medicine and engineering, some of them go into industry, trade and commerce ; some preceed for university education in and outside the country ; a few enter civil administration and armed forces and only a very few prefer to go in for politics. In 1972, a Remian made his first appearance in the arena of politics and he was elected an M. P. It is interesting to note that he was the youngest amongst the M.P's. The stalwart Remian Shafiqul Gani Swapan, a worthy son of a worthy father, figured prominently as an assiduous politician when he was appointed State Minister for Civil Aviation. His quick rise to position of a full-fledged Mninister (Public Works Department) simply bears testi mony to his rare qualities of statesmanship. Another Remian Golam Sarwar Milon, young in age but old in wisdom shines like

a bright star in the political sky of Bangladesh and has already made his mark as Deputy Minister for Education. We feel proud of these illustrious Remians and expect them to be really drawn to the vortex of politics and to contribute their mite to peace and prosperity in national life.

We cannot but appreciate the immense services of CLOTHE THE NUDES an organization run by the Remians to mitigate the sufferings of the less fortunate children of our country.

Our hearts weel with pride when we hear about the marvelllous achievements of the Remians in any branch of human knowledge or in any walk of life. But unfortunately, we do not have a consolidated list of 3500 Remians traversing allmost every corner of the globe either in pursuit of knowledge or in search of fortune. Nor do we have accurate information about their marvellous performance in various walks of life.

We have reason to apprehend that the college is going to be an expensive institution for the richer and upper classes just because the scholarship scheme wich was once introduced to ensure democratic basis of equal opportunity for equal merit and to draw meritorious students from homes having low income, has come to a standstill. Furthermore, the fervent appeal to philanthero-pists, industrists and business community has been of no avail. Under the circumstance poor but talented boys cannot find entry into it. Naturally, they prefer to join cadet colleges because education is comparatively cheap there. "About 30% of the cadets pay no fees and the reminder contribute according to their guardians income. Even the full fee is modest and does not cover the cost of the cadets's education". This is why a poor boy from a village hut in a jungle can, if he has the talent, enter a cadet college along with the sons of industrialists, bankers and business magnates. However, if we fail to throw the door of the college open to the poor but meritorious students, our apprehension may come true and its academic standard is sure to detorieate. So we appeal to the Government for liberal allocation of money in the form of grants and school arships. What chiefly justifies the liberal allocation of public money is the presence of moral values and a high sence of discipline among the students of this institution. In harmony with tradition of a public school, here students are nominated to different prefectorial boards to run student affairs under the direct supervision of teachers.

Now-a-days there has been an appalling erosion in the moral and ethical values at all levels

of social strata. Our college is not an isolated island. On the contrary, it is in the heart of the capital city. Therefore, the repurcussions of political or social convulsions taking place almost everyday in the city affect the corporate life of the college. At this critical juncture the college can no longer give guarantee of discipline of high standard. It cannot offer a guarante of peaceful academic atmosphere, either. However, in spite of nation-wide social and political unrest, specially amongest the younger generation, the college success in discharging its main function to shape the behaviour pattern of its students in conformity with the social demands, needs and requirements.

It goes without saying that pupils, teachers and other employes of a residential institution live together peacefully day after day and come in close contact with one another as if they were the members of the same family. In 1960 this family, or ours consisted of about 400 heads. At present the number of students and other members has shot up beyound imagination and is out of all proportion to the accomodation capacity. For example, the same building still stand as a silent witness to the trials and tribulations to accommodate 602 students as against 340 in 1960. The same playgrounds struggle hard to hug and cater for to many kinds and full-blooded young ones.

Hither to parents, pupils, patrons and teachers huddled up against one another under the benyan tree with a view to attending a cultural function just because the construction of the auditorium, which had passed through the terrible ordeals of frequent changes in the plans, started (perhaps most) ominously long before the liberation war if never to see its completion, nor to become lively with the hubbub of those for whom it was meant. Now we can heave a sight of relief as it is nearing completion and is almost ready to resound with a thousand jubilant voices

The teacher of a residential institution plays a most vital role in the education of his student. His sole duty is to build up his character in such a way that on completion of his education he may be able to discharge worthily the responsibilities of democratic citizenship ; all other duties are incidental. Therefore, he virtually turns into the shadow of his pupil and follows him round the clock guiding his every action. He not only forms an inseparavle part of his enviornment, but also manipulates it as an educator. He teaches him in the classroom provides him with parented care

in the Houses, inspires him in the field, and offers him guide in all other co-curricular activities. Inspite of the existence of discouraging and disappointing social conditions, there are yet some teachers who pursue their profession as true missionaries—with the sole object of fashioning true human beings for making the mother earth fit for human habitation.

Lastly, we expect our Remians to come forward to make more specific contribution to the onward march of progress of their Alma Mater where they once harmoniously lived under the same roof, happily spent the most impressionable stage of life and enthusiastically and spontaneously made friendship of life long duration which was reflected in the reunion held in March, 1987.

স্কুল ভবন